বাংলাসাহিত্যে

কবিতায় গ্রন্থউৎসর্গ

শুভঙ্কর রায়চৌধুরী

নালন্দা প্রেস
পাবলিকেশন বিভাগ
১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

॥ ডি-ফিল্ উপাধির জন্য প্রদত্ত, ডাঃ সুশীলকুমার দে ডাঃ সুকুমার সেন ও ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিগৃহীত (রেজিস্ট্রারের পত্র নং বিবিধ ১০১০-১০১৩/ ডি-ফিল্ তাঃ ২৭-২৮|৪|১৯৯৫ খৃীঃ) গবেষণাগ্রন্থ ॥

॥ মুদ্রাকর ও প্রকাশক ॥
শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র
নালন্দা প্রেস
১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

সরিৎশেখর মজুমদার
সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
—স্মরণে

"নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায়
নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যাথা
একা একা বাস করে।।"

প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

কবিতার মাধ্যমে গ্রন্থ উৎসর্গের এই সংকলন প্রস্তুতিতে অনুপ্রেরণার উৎসমূলে ছিলেন বহু গ্রন্থের লেখক রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবি পবিত্র অধিকারী। এই গ্রন্থে আমি নতুন কোনো তথ্য সংযোজিত করতে পারিনি। বিভিন্ন আকর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলি বিষয়ানুগ সন্নিবেশিত করেছি মাত্র।

তথ্য-সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য অবধারিত ভাবেই গ্রহণ করতে হয়েছে। এবিষয়ে জাতীয় গ্রন্থগার, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বড়িশা পাঠাগার এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিবিধ তথ্যের যোগান দিয়ে সাহায্য করেছেন শচীন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ অমিতা চক্রবর্তী, পবিত্র অধিকারী, পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বদেব গঙ্গোপধ্যায়। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বেহালা বইমেলায় আমার সহযোদ্ধা দেবাশিস মজুমদার পাণ্ডুলপির চূড়ান্ত প্রুফ সংশোধনের কাজ করে যথার্থ বন্ধুকৃত্য করেছেন। ওঁকে সাধুবাদ জানাই।

এই কাজে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন নীলকণ্ঠ ঘোষাল, সমরদাস, মিলন গোপাল গোস্বামী, ললিত মাইতি এবং আরো আনেকে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই দুজন প্রয়াত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হয় যাঁরা আমার এই কাজটিকে ছাপার অক্ষরে দেখার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এঁরা হলেন কবি সরিৎশেখর মজুমদার এবং বাংলাভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি বরাবরই এঁদের স্নেহধন্য ছিলাম।

এই গ্রন্থ প্রস্তুতিতে অন্তরালে থেকে আরেকজন যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমার স্ত্রী। একান্ত আপন বলে এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের দায়বদ্ধতা সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেলাম।

কৃতজ্ঞতা জানাই আনন্দ প্রকাশনের কর্ণধার আনন্দ মণ্ডলকে। তিনি যে আগ্রহের সঙ্গে এরকম একটি অ-বাণিজ্যিক গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত। কৃতজ্ঞতা জানাই বেঙ্গল পি.টি.এস এবং আদ্যশক্তি প্রিণ্টার্স এর কর্ণধারদ্বয় ও কর্মীবৃন্দকে। সদাহাস্যময় অনুজপ্রতিম শিল্পী প্রণব হাজরাকে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ নির্মাণের জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

বাংলা সাহিত্যে কবিতায় গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়ে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ, একথা বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু একথা বলতে পারি এই কাজটি করার প্রয়াসে আমার আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না।

শুভঙ্কর রায়চৌধুরী

প্রসঙ্গ ঃ উৎসর্গ

গ্রন্থ উৎসর্গ—বিষয়টি কি?—ইংরেজ লেখক H B Wheatley-র ভাষায় "Dedications are seen as the spontaneous expression of an author's love and respect for his friends or his patron."

প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের দু'মলাটের মধ্যে উৎসর্গপত্রে থাকে লেখকের গহন মনের এক সুপ্ত বাসনা। সে বাসনায় প্রকাশ পায় লেখকের বন্ধুপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা, স্নেহভাজনের প্রতি স্নেহ অথবা বদান্য পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি অনিচ্ছাকৃতভাবেই পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়ে গ্রন্থকর্তাকে কি কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলতে হয়? এ ব্যাপারেও লেখক Wheatley র শরণাপন্ন হয়ে বলা যায়, "It is not necessary that the person to whom the book has been dedicated should in any way be connected with its subjects."

কবিতায় গ্রন্থ উৎসর্গের মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশের আগে 'উৎসর্গ' শব্দটির ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধান করা যাক। এ বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানের পাতা উল্টে পেলাম—উৎসর্গ—উৎ = সৃজ্ (ত্যাগ করা) + তা (ভাঃ) গ্রা = উচ্ছুগগু, ১১—১২ শতাব্দীর প্রা. বাং = উছরগ, উছর্গ, উছরগিয়া = উৎসর্গিয়া = উৎসর্গ করিয়া (মানিক পীরের গান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) বি. জীবিত বা মৃত পৃষ্ঠপোষক ; ভক্তিভাজন স্নেহানুরাগভাজন বা বন্ধুর নামে পুস্তকাদি নিবেদন বা সমর্পণসূচক লিপি বা লেখ। রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় পাই—সদুদ্দেশ্যে অর্পণ, dedication, দেবতাকে নিবেদন। স্বত্বত্যাগ, দান। এ কথায় প্রশ্ন ওঠে তা'হলে 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ'—এ প্রবাদবাক্যটি কোন্ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে? হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় বেশ কিছু খৈ বাতাসে উড়ে গেলে অর্থাৎ নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে গোবিন্দকে দান করা হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা? নাকি দেবতার সঙ্গে একটু মস্করা করা? কারণ এই অর্পণ অবশ্যই সদুদ্দেশ্যে নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ব্যাখ্যা একটু অন্য রকম। তিনি লিখেছেন—'অনন্যোপায় বা বাধ্য হইয়া কোন সৎকার্যে নিয়োগ কল্পনা করা। যাহা হাতছাড়া হইতেছে তা স্বেচ্ছায় সৎকার্যে নিয়োগ বা দান করার ভান।

প্রসঙ্গত বলি, প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উড়ো

খৈ' (প্রথম প্রকাশ ১৩৪১) নামক কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন গোবিন্দকে। গ্রন্থটির নাম যেহেতু 'উড়ো খৈ' সেই কারণেই কি গোবিন্দকে উৎসর্গ করা। এখানে গোবিন্দ কে? উত্তরটি অজানা। রসসাহিত্যিক তাঁর এই গ্রন্থের পাঠক সমাজের যে কোন ব্যক্তিকেই নিজেকে গোবিন্দ হিসাবে কল্পনা করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

উৎসর্গপত্রে উৎসর্গ শব্দটির পরিবর্তে উপহার, মঙ্গলাচরণ, স্নেহোপহার প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। আবার কোনো শব্দ ব্যবহার না করে উৎসর্গিত ব্যক্তির নাম বা সম্পর্কের উল্লেখের মাধ্যমে উৎসর্গপত্র সমাধা হয়েছে, এমনও অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎসর্গ শব্দটির পরিবর্তে অনেক গ্রন্থেই 'উপহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে উৎসর্গপত্র বর্জিত গ্রন্থও দেখা যায়।

অনেক উৎসর্গপত্রে কোন কিছুই স্পষ্ট করে না বলে লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত অভিনব উৎসর্গ পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এ রকম উৎসর্গ পত্রগুলি অনেকটা ধাঁধারই নামান্তর। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'অমাবস্যা' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬। এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কোন নামের উল্লেখ নেই, শুধু মুদ্রিত রয়েছে, "হে অসূর্যম্পশ্যা, তুমি অমাবস্যা মোর"। এখানে লেখকের অসূর্যম্পশ্যা কে? উত্তরটি কল্পনা করে নিতে হয়। আরও একটি অভিনব উৎসর্গপত্রের সন্ধান পাই সজনীকান্ত দাস এর-"আত্মস্মৃতি' (২য় খণ্ড) গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থে লেখক উৎসর্গের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে একটি মুখের স্কেচ ও একটি কবিতা উৎসর্গপত্রে ব্যবহার করেছেন। মুখের স্কেচটি কার এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ উৎসর্গপত্রে বা গ্রন্থে ছিল না। পরবর্তী সংস্করণে মুখের স্কেচটি বর্জিত হয়ে 'রবীন্দ্রনাথ মৈত্র' নামটি যুক্ত হয়।

বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ উৎসর্গের রেওয়াজ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যেও এর নজির মেলে না। ইংরেজি সাহিত্যে রেনেসাঁস-এর সময় (১৫২৫-১৫৭৮) থেকে গ্রন্থ উৎসর্গের সূচনা হয়। ক্লাসিকাল পণ্ডিত ও সুলেখক রোজার অ্যাস্কাম এই প্রথা প্রচলনের অগ্রগণ্য পুরোধা। তিনি তাঁর ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'Toxophilus' (১৫৪৫) ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরিকে উৎসর্গ করেন।

বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ উৎসর্গের প্রথা প্রচলন করেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। বীটন সোসাইটিতে (ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটনের স্মৃতির প্রতি

সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট [F. J. Mouat] সাহেব এদেশীয় কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহায়তায় কলকাতায় বীটন সোসাইটি নামে একটি সাহিত্যসভা গঠন করেন) পঠিত তাঁর একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ "বাঙলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। রামবাগানের দত্ত পরিবারের হরচন্দ্র দত্ত এবং কৈলাসচন্দ্র বসু উভয়েই বাংলা কবিতা নিম্নমানের, এই বিবেচনায় সমালোচনা করেন এবং তারই প্রতিবাদ স্বরূপ রঙ্গলাল 'বাঙলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধটি' পাঠ করেন। 'বাঙলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ির স্নেহধন্য কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পৌত্র সত্যচরণ ঘোষালকে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৫২)। উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ ঃ—

মঙ্গলাচরণ

পরম পূজনীয়-শ্রীযুত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল
বাহাদুর শ্রীচরণাম্বুজেষু।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন মিদং—

এ অকিঞ্চনের প্রতি ভবদীয় অসীম করুণা ও স্নেহের যৎসামান্য স্বীকৃতিচ্ছলে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ শ্রীচরণ কমলান্তরালে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উৎসর্গ করিলাম, ইতি—

খিদিরপুর সেবক শ্রী রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২ জ্যৈষ্ঠ
১২৫৯ বঙ্গাব্দ

১২৫৯ বঙ্গাব্দের পর ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয় রঙ্গলালের কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' এবং ঐ একই বছরে পৌষ মাসে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' গ্রন্থটি ভূকৈলাস রাজ পরিবারের রাজা সত্যশরণ ঘোষালকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রটি এইরূপ ঃ—

মঙ্গলাচরণ

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল
বাহাদুর মহাশয় শ্রী চরণাম্বুজেষু

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং

মহাশয়, আমার প্রতি বাল্যাকালাবধি অকৃত্রিম স্নেহসহকারে যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই উৎসাহ তরু সমাশ্রিত শ্রদ্ধালতাজাত সামান্য উপহার স্বরূপ এই কাব্যকুসুম ভবদীয় শ্রীচরণ কমলান্তরালে সমর্পিত করিলাম।

খিদিরপুর — অনুগৃহীত ভৃত্য

১৯ শে আষাঢ় ১২৬৫ বঙ্গাব্দ — শ্রী রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) নাটকটি পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এইরূপ ঃ

মঙ্গলাচরণ

মদেক সদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদন মিদং।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য হইব।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করেন। ইতি

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য! — কলিকাতা ১৫ পৌষ

সন ১২৬৫ সাল।

অধিকাংশ উৎসর্গপত্র সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হলেও অনেক উৎসর্গপত্রে আস্বাদন করা যায় অনুপম সাহিত্যরস অথবা সুললিত কাব্যসুষমা। কবি নবীনচন্দ্র

সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) উৎসর্গ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। সাহিত্যরস সমৃদ্ধ উৎসর্গপত্রটি এইরূপ ঃ—

দয়ার সাগর

পূজ্যতম

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দেব!

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল। আপনার আশীর্ব্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল ; এই কারণ তাহার এত আনন্দ। বঙ্গ কবিরত্নগণ স্বীয় মানস উদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি সেরূপ পবিত্র পরিমল-বিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়-কানন ; আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে সেই দেবপদ অর্চ্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

আমার এই মাত্র সাহস—এই মাত্র ভরসা।

১লা বৈশাখ, আপনার চিরানুগত

সন, ১২৮২ শ্রী নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেনের অন্যান্য গ্রন্থগুলির উৎসর্গপত্র একই ভাবে সাহিত্য রস সমৃদ্ধ।

উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়টি ভালভাবেই প্রচলিত হয়। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সকল খ্যাতিমান লেখকই নাতিদীর্ঘ গদ্যের মাধ্যমে গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অনুসরণে বাংলায় গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়টি প্রচলন হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজি সাহিত্যেও কবিতার মাধ্যমে গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ইরেজ কবি John Keats ১৮১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Poems' গ্রন্থটি একটি কবিতার মাধ্যমে কবির সুহৃদ Leigh Hunt Esq. কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ ঃ—

DEDICATION

TO LEIGH HUNT, ESQ

GLORY and loveliness have passed away ,
for if we wander out in early morn,
No wreathed incense do we see upborne
Into the east, to meet the smiling day :
No crowd of nymphs soft voic'd and young, and gay ;
In woven baskets bringing ears of corn,
Roses and pinks, and violets, to adorn
The shrine of Flora in her early May.
But there are left delights as high as these,
And I shall ever bless my destiny,
That in a time, when under pleasant trees
pan is no longer sought, I feel a free
A leafy luxury, seeing I could please
with these poor offerings, a man like thee.

বাংলা সাহিত্যে কবিতায় গ্রন্থ উৎসর্গের পাশাপাশি, সংস্কৃত বা বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করে গ্রন্থ উৎসর্গের নজিরও বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বহু পরিচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্রর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকাকালীন দীনবন্ধু মিত্রর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। আনন্দমঠের উৎসর্গপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন ঃ—

ক্ব নু মাং ত্বদীধনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্ন সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতু বন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

"স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এ গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল।"

বঙ্গানুবাদ ঃ—আমি আমার প্রাণের জন্য তোমার উপর নির্ভরশীল ; জলরাশি যখন সেতু ভঙ্গ ক'রে চলে যায় তখন তার মধ্যস্থিতা মৃণালিনীর যে

অবস্থা হয়, আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে দীর্ঘকালের প্রেমমুহূর্তে ত্যাগ করে তুমি কোথায় গেলে? (সূত্র ঃ—মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্য, ৪র্থ সর্গ ৬ষ্ঠ শ্লোক—সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (২য় খণ্ড) নবপত্র প্রকাশন, সংস্করণ, ১৯৭৮)।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসটিও উৎসর্গ করেন দীনবন্ধু মিত্রকে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটি উৎসর্গ করেন 'সোদর সদৃশ বঙ্কিম'কে। উৎসর্গপত্রটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

অসেচনক শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ.

একাত্মবরেষু

সোদরসদৃশ বঙ্কিম!

তুমি আমাকে ভালবাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাবসিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার 'নবীন তপস্বিনী' প্রকৃত তপস্বিনী—বসনভূষণবিহীনা—সুতরাং জনসমাজে যদি 'নবীন তপস্বিনী'র সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু 'নবীন তপস্বিনী' সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই ; অতএব প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি—

অভিন্নহৃদয়
শ্রী দীনবন্ধু মিত্র

কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'পূর্বলেখ' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থটি বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করে উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উৎসর্গপত্রটি এইরূপ ঃ—

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হুয়ামি তে মনসামন ইহেমানগৃহাণ্ উপজুজুযান এহি।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বাবাতা উপবান্ত শগ্মাঃ॥
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ।
ইহেধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ॥

উৎসর্গের এই চারটি পঙ্ক্তি কবি বিষ্ণু দে অথর্ববেদ সংহিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

প্রথম দুই পঙক্তির বঙ্গানুবাদ ঃ—হে প্রেতপুরুষ, তোমার মন আমাদের মনের সাথে এ লোকে আহ্বান করছি। আমাদের গৃহে তোমার উদ্দেশে যে ঔর্ধ্বদৈহিক কর্ম করা হচ্ছে, তাতে প্রীত হয়ে এস। সংস্কারের পর পিতৃ, পিতামহ, প্রপিতামহদের সাথে এবং পিতৃগণের অধিপতি যমের সাথে মিলিত হও। পিতৃলোকে গমনকালে তোমার যে পথশ্রম হয়েছে, তা অপনোদনের জন্য নিরন্তর সুখকর বায়ু তোমার কাছে প্রবাহিত হোক। ১৮।২।৩।

শেষ দুই পঙক্তির বঙ্গানুবাদ ঃ—হে দীপ্ত পাংসুতে আহিত, উম্মুক তুমি এ পাংসুরূপ প্রদেশেই থাক, আমাদের ধনদাতা হও, এখানে প্রজ্ঞাতা হও, এখানে আমাদের কর্ম-সম্পাদক হও, এখানে বলবান অন্নের বিধাতা হও ও শত্রুর দ্বারা অপরাজিত হয়ে অবস্থান কর। ১৮।৪।৪।

[সূত্র ঃ—অর্থববেদ সংহিতা, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ বিজনবিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী]

উৎসর্গপত্র অনুসন্ধানের কর্মে লিপ্ত হয়ে বাংলাসাহিত্যে আরও একটি অভিনব উৎসর্গপত্রের সন্ধান পাই। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গণিতের কি কোন সম্পর্ক আছে? হয়তো নেই, হয়তো বা আছে। তাই, বাংলা সাহিত্যে একটি গাণিতিক উৎসর্গপত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর গণিতচর্চার ফাঁকে কিছুদিন কাব্যচর্চা করেছিলেন। এর অজুহাত হিসাবে অধ্যক্ষ ঘোষ লিখেছিলেন, "...আমার মধ্যে একটু কাব্য রোগের Eruption দেখা দিয়াছিল। তাছাড়া সঙ্গদোষেও ব্যাধিটি সংক্রামিত হইয়া থাকিতে পারে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ছিলেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের সহকর্মী ও বন্ধু।

অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের "ত্রৈরাশিক" (প্রথম প্রাকশ আশ্বিন ১৩৬৯) কাব্য গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রটি ছিল এইরূপ ঃ—

উৎসর্গ

সমাস

গদ্য + কবিতা = গবিতা

(মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)

ত্রৈরাশিক

কবিতা ঃ কবি ঃ ঃ গবিতা ঃ x

∴ x = গবি

উৎসর্গ

সাম্প্রতিক তরুণ গবি-গোষ্ঠীর

অক্ষম অনুসরণে

তাঁহাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ

প্রণামান্তে

এই

ত্রৈরাশিক

গবিতা সঙ্কলনটি

পরম ভক্তিভরে

তাঁহাদেরই উদ্দেশে

উৎসৃষ্ট

হইল

লক্ষণীয়, এই উৎসর্গপত্রে লেখক বাংলা ব্যাকরণ ও গাণিতিক সঙ্কেত নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। গাণিতিক পরিভাষায় এই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণের ব্যাখ্যাও লেখকের কলম থেকে জানতে পারা যায়। "সঙ্কলনটির নাম দিয়াছি "ত্রৈরাশিক"। কেন দিলাম, বোধ করি তাহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম কথা, জীবনে বহুদিন অঙ্কের মাষ্টারী করিয়াছি, বহু গণিত পুস্তকও রচনা করিয়াছি ; সুতরাং কোন বই-এর নামকরণের সময়ে গাণিতিক নামই সহজে মনে আসে। উৎসর্গ পত্রে 'ত্রৈরাশিক' টি কষিয়াও দিয়াছি—সংক্ষেপে। তাছাড়া, আরও একটু কারণ আছে। বইখানি নাড়াচাড়া করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সব কয়টি কবিতাই ত্রিনামাত্মক, অর্থাৎ ত্রৈরাশিক। তাই ঐ নামটিই বহাল রাখিলাম। বইখানি কিন্তু গণিত নহে, রসায়ন—রসস্য নিবেদনম্।"

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাংলা সাহিত্যে কবিতায় গ্রন্থ উৎসর্গের পথ-প্রদর্শক বলা যায়। কবি বিহারীলাল তাঁর রচিত বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল

(১৮৭৯) গ্রন্থ দুটি কবিতায় উৎসর্গ করেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন লেখককে জানতে হলে তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়টিও অনুধাবন করা প্রয়োজন। গ্রন্থকারের সঙ্গে গ্রন্থের উৎসর্গীকৃত ব্যক্তির সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারলে অনেক নতুন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কিছু কবি-সাহিত্যিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা উৎসর্গের কবিতাগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। কবিতায় গ্রন্থ উৎসর্গ—বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টির দৃষ্টান্ত অফুরান। এই গ্রন্থে সংকলিত গ্রন্থ উৎসর্গের কবিতাগুলি ছাড়াও আরও কিছু গ্রন্থ উৎসর্গের কবিতা এই গ্রন্থে সংকলনভুক্ত করা যায়নি। পরবর্তী সংস্করণে সেই সকল কবিতা গ্রন্থভুক্ত করার ইচ্ছা থাকলো।

বিহারীলাল চক্রবর্তী
(১৮৩৫—১৮৯৪)

[বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯)]

কবিগুরুর গুরু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাংলা সহিত্যে কবিতায় গ্রন্থ উৎসর্গের পথ-প্রদর্শক বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখ কবিরা ছিলেন বিহাবীলালের ভাবশিষ্য। বিহাবীলালের কাছে নিজেব ঋণ রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—"বর্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিযাছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না।" এই প্রসঙ্গেই বিহারীলালকে নিজের কাব্যগুরু বলে অভিহিত করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' তে রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারীলালের বর্ণনা করেছেন—"তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।"

বিহারীলালের রচিত গ্রন্থগুলি ঃ—স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), সাধের আসন (১৮৮৯)। 'সাধের আসন' বিহারীলালের শেষ কাব্যগ্রন্থ।

এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্যদ্বয়ে 'উপহার' শীর্ষক কবিতা পাওয়া যায়। বঙ্গসুন্দরী কাব্যের প্রথম সর্গটি উপহার শীর্ষক কবিতায় নিবেদিত। প্রথম সর্গের শেষে কবি লিখেছেন—ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে উপহার নাম প্রথম সর্গ।" বঙ্গসুন্দরী কবি কৃষ্ণকমলবাবুকে উপহার দেন। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন কবির বাল্যবন্ধু।

উপহার সর্গে কবি লেখেন—

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,

হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়। (১।২৯)

কবির এই 'প্রিয়তম সখা' হলেন শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কৃষ্ণকমলবাবু তাঁর বঙ্গসুন্দরী বইএর উপহার কবিতার নিচে একটি টিপ্পনী লিখে রেখেছিলেন। "এই সখা তাঁহার বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। এই কয়েকটি পদ্যপঙ্‌ক্তি কৃষ্ণকমল নিজের Certificate এর মত জ্ঞান করেন এবং Value করেন। বিহারীর পদ্য যদি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটা টেঁকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিপ্পনীটি সংযোগ করিয়া রাখিলেন।"

বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কবি বঙ্গরমণীর রূপ বিভিন্নতার বর্ণনা করেছেন—

"এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
আটজন নারী রাজে,
স্নেহ, প্রেম করুণা আধার। (১।৫০)
সুরবালা, চিরপরাধিনী
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই অষ্ট বঙ্গ সীমন্তিনী।" (১।৫১)

এই আট রকমের ভাব কল্পনায় কবি বঙ্গ সীমন্তিনীদের দেখেছেন। 'উপহার' শীর্ষক প্রথম সর্গের শুরুতে ভবভূতির উক্তি উদ্ধৃত করে কবি বিহারীলাল বলেছেন—বন্ধুপ্রীতি শুধুমাত্র হৃদয়ানন্দকরই নয়, বন্ধুর প্রগাঢ় আলিঙ্গন শরীরের তৃপ্তিদায়কও বটে।

বঙ্গসুন্দরী কাব্যগ্রন্থটির উপহারপত্রটি ৫২টি স্তবকের একটি সুদীর্ঘ কবিতায় রচিত। উৎসর্গ কবিতাটি পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হল—

বঙ্গসুন্দরী

প্রথম সর্গ

উপহার

———

"গাত্রেষু চন্দনরসী দৃশি শারদেন্দুরানন্দ এব হৃদয়ে।"
—ভবভূতি

১

সর্ব্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা।
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

২

লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

৩

শূন্যময় নির্জ্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

৪

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে।
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থ ভরা ধরা!
কত আরে থাকিবি ধরিয়ে?

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

৬

গর্ব্বভরা অট্টালিকা হায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায় ;
বৃক্ষ লতা অগণন
ঘেরে কোরে আছে বন,
উপবে বিষাদ-বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে ;
যথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

১০

গিয়ে তার তীর-তরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব-সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু-কালে মিত্র এলে,
লোকে যেন্নি চক্ষু মেলে,
তেন্নিতর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসঙ্ঘ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহা বেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন।

১৬

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেস ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে, সে সকলে।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই ;

চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদেব সঙ্গেতে বেড়াই।

২০

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝব্‌,
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম।
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী।

২২

ববষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

২৩

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

২৪

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে।

২৫

হায়রে সে মজার স্বপন,
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার
সবে ছিল আপনার
যবে সবে-নূতন যৌবন!

২৬

ওহে যুবা সরল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন ;
হয় হয় প্রায় ভোর,
ছোটে ছোটে ঘুম-ঘোর ;
উঠ এই করিতে ক্রন্দন!

২৭

কে তুমি? কে তুমি? কহ! হে পুরুষবর,
বিনির্গত-লোলজিহ্বা, উলট-অধর,
চক্ষু দুই রক্ত পর্ণ,
কালি-ঢালা রক্ত বর্ণ,
গলে দড়ি, শূন্যে ঝোলো, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!

২৮

সদা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছ আমার,
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্ব্বার ;
নিতে নিজ-আলিঙ্গনে
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে,
সম্মুখেতে দুই বাহু করিয়া বিস্তার।

২৯

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

৩০

আহা কিবে প্রসন্ন বদন!
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন ;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি-বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

৩১

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর ;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

৩২

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার ;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

৩৩

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই ;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

৩৪

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন ;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

৩৫

ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

৩৬

নিরিবিলে থাকিলে দু-জন,
কেমন খুলিয়া যায় মন ;
ভোর্ হয়ে ব'সে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।

৩৭

আ। আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
নিজ কর-করবাল
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।

৩৮

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদুর "দর্শন" সূর্য্যলোকে ;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে।

৩৯

পোড়ে যার প্রখর ঝলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায় ;
তুমি তায় মন-সুখে,
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।

৪০

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।

৪১

করি' সে সংগীত-সুধা পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আসে-পাশে
সমুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তা'তেই নয়ান।

৪২

পরস্পর উল্টতর কাজে,
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে,
চোকে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাঝে।

৪৩

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দু-জন।

৪৪

হেরি নাই কখন তোমার—
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদ-গর্ব্বে জ্ঞানহত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় দ্বোধার।

৪৫

তোষামোদ করিতে পার না,
তোষামোদ ভালও বাস না ;
নিজে তুমি তেজীয়ান্,
বোঝ তেজীয়ান্-মান ;
সাধে মন করে কি মাননা ?

৪৬

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে
চতুর্দ্দিকে জাগে একস্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে।

৪৭

প্রবেশিলে তোমার অন্তর,
মাণিকের খনির ভিতর
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর !

৪৮

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পুরিয়ে ওঠে প্রাণ ;
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দু-নয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

৪৯

ওহে সখা সরল সুজন।
করি আমি এই নিবেদন,
যে ক-দিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'র না গমন।

৫০

করে আজি অর্পিনু তোমার,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার ;
এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
আট জন নারী রাজে,
স্নেহ প্রেম করুণা আধার।

৫১

সুরবালা, চির পরাধিনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই অষ্ট বঙ্গ-সীমন্তিনী।

৫২

চিত্রিতে এঁদের দেহ, মন,
যথাশক্তি পেয়েছি যতন ;
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ,
ধেয়ায়েছি একতান,
দেখ দেখি হয়েছে কেমন।

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে উপহার নাম প্রথম সর্গ

'সারদামঙ্গল' কাব্যের সারদা একদিকে কবির মানস-মরালী আর একদিকে বিশ্বের সৌন্দর্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সারদামঙ্গল কাব্যের উপহার শীর্ষক কবিতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখিত—"নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার। জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার—" যিনি, তার উদ্দেশেই সারদামঙ্গল কাব্য উপহার দেওয়া হয়েছে। 'উপহার' শীর্ষক কবিতাটি এইরূপ ঃ—

উপহার

গীত

ভৈরবী—আড়াঠেকা

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি-ফুলহার!
মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার!
কুসুম-কানন-মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে?
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার?
হয় তো হ'ল না দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—
ধর, ধর, স্নেহ-উপহার!
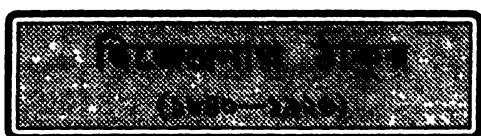
[যৌতুক কি কৌতুক, ১২৯০]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কন্যাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। একুশ বছরের বড়ো দ্বিজেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ পিতৃতুল্য সম্ভ্রম করতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন গঠনে অন্যান্যদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভূমিকাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ "যৌতুক কি কৌতুক" নামে একটি ক্ষুদ্র গাথাকাব্য রচনা করেন। এটি ছিল 'রবি'র বিয়েতে তাঁর 'প্রীতি উপহার'। 'যৌতুক কি কৌতুক' ভারতী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কাব্যটির শেষে একটি উৎসর্গ-কবিতা যুক্ত হয়েছে। উৎসর্গ-কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ—

ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ/-এক কথায়-/উপসর্গ
শর্ব্বরী গিয়াছে চলি'! দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা ল'য়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিষিয়া তা'রে
"অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হো'ক্
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মন্দ্রজা'র কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক॥"

উৎসর্গ-কবিতাটির উপহারের লক্ষ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ। উৎসর্গ-কবিতাটি রচনার পশ্চাতে রবীন্দ্রজীবনের একটি কৌতুককর ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। 'মন্দ্রজার কারে যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক'—উৎসর্গের

কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কথায় কৌতুককর ঘটনাটির অবতারণা করা হোল। মংপুতে থাকার সময় (১৩৪৫) রবীন্দ্র স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন—"জানো একবার আমার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য Province (? মাদ্রাজ) এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে, জমিদার আর কি, বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্প বয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাত সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে ব'সে রইল ; আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস্। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালে ভালো—তারপর music সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'ল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়!—এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে—সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বল্লেন,— 'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my daughter'।...আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে চুপ ক'রেই রইলুম।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যটি সম্ভবত এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই লেখা হয়েছিল। বলাবাহুল্য এই অসম বিবাহ প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো রক্ষণশীল ব্যক্তি খুশিই হয়েছিলেন।
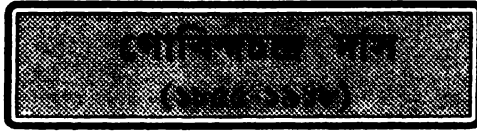
[প্রেম ও ফুল (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), কস্তুরী (১৮৯৫)
চন্দন (১৮৯৬), ফুলরেণু (১৮৯৬), বৈজয়ন্তী (১৯০৫)]

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙালি কবি ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস "নাগরিক কবি নন, রবীন্দ্র শিল্পলোকের কবি নন, রোমান্টিক সৌন্দর্য্যের কবি নন। তিনি গ্রামের কবি, স্বভাবের কবি, অংসযত প্রসাধনহীন, ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের কবি।" (গোবিন্দচন্দ্র দাস—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ-৮০, সংখ্যা-৪, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।) এই উদ্ধৃতাংশটি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক।

গোবিন্দচন্দ্রকে সমগ্র জীবনই দুঃখে কষ্টে এবং শোকে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। সর্বোপরি প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর বিয়োগব্যথা পত্নীপ্রেমিক কবির ব্যক্তিগত জীবনের ও কাব্যজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সারদাসুন্দরীর তিরোধানের পর পত্নীপ্রেমিক কবি তার 'সারদাসুন্দরী' কবিতায় লিখলেনঃ–

"আজ কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?
তোমার অধিক শোভা,
ততোধিক মনোলোভা
শোয়ায়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর
লাবণ্য তোমার চেয়ে
সুধা পড়ে ঠোঁট বেয়ে
অনলে উছলে যেন রূপের সাগর।"

কবির 'প্রেম ও ফুল' এবং 'কুঙ্কুম' কাব্যগ্রন্থ দুটি কবির প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থ দুটি কবিকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। গোবিন্দচন্দ্র 'প্রেম ও ফুল' এবং 'কুঙ্কুম' কাব্যে সারদাসুন্দরীকে চিরস্মরণীয় করেছেন।

'প্রেম ও ফুল' কাব্যগ্রন্থের উপহার শীর্ষক কবিতা :–

উপহার

সারদা!

হৃদয়-রাণি, প্রীতির প্রতিমাখানি,
এস গো পূজিব আজি প্রেম ও ফুলে!
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর সবি মাখা মাটী ও ধূলে!
এই ফুল—এই প্রীতি, দিয়াছি—দিতেছি নিতি,
যদিও—যদিও দেবি, চরণমূলে,
তবু না ফুরায় আর, নূতন সৌন্দর্য্য তাঁর,
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উথুলে!

কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি,
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে!
আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা,
আছি তব বিশ্বরূপে ডু'বে অকূলে!
অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, দুঃখ নাই,
ভক্তি ভরে যাহা পাই দিতেছি তু'লে,
মানুষ পাবে কি আর, তব যোগ্য উপহার?
আদরে অঞ্জলি দেই প্রেম ও ফুলে।

১লা ফাল্গুন, ১২৯৪
কলিকাতা

'কুঙ্কুম' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রের উপহার কবিতাটি এইরূপ ঃ–

উপহার

কারে দিব উপহার?
যাহারে বাসনা দিতে, সে কিগো চাহিবে নিতে?
সে যে করে অবহেলা—ঘৃণা—তিরস্কার!
থাক্ তার কাছে গেলে, দূরে থেকে থুথু' ফেলে,
সে করে আমার নামে 'নেকার-নেকার!'
সহস্র যোজনে থাকি, যদি মনে মনে ডাকি,
সে নাকি 'বিষম' যায় স্মরণে আমার!

আমারি স্মরণে হায়, সে নাকি 'উছট্' খায়,
ডরায় স্বপন দেখে বিকট আকার।
আমি নীচ—সে যে উচ্চ, সে মহৎ—আমি তুচ্ছ,
আমি তারে ভালবাসি—কলঙ্ক তাহার।
তারি নিন্দা—তারি গালি, এ পুস্তক-ভরা খালি,—
কলঙ্কের ইতিহাস শুধু দেবতার!

২৯শে চৈত্র, ১২৯৬ সাল
জয়দেবপুর—ঢাকা

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে কবি প্রেমদাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। কবির 'কস্তুরী' কাব্যগ্রন্থটি দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত।

'কস্তুরী' কাব্যগ্রন্থের উপহার শীর্ষক কবিতা ঃ—

উপহার

শ্মশান ধুইয়া তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে,
কলতানে মৃদুগানে বনে বনে ঘুরি,
অকস্মাৎ পাশে তার, বহে মন্দাকিনী ধার—
ভীষণ গর্জ্জনে পদ্মা ব্যোম ভাঙ্গিচুরি!
চড়িয়া কুসুম-ভেলা, করিতে সলিল-খেলা
অমর বালিকা এক—অপূর্ব্ব মাধুরী—
ভুলে মরতের পথে, ভাসিয়া আসিয়া স্রোতে,
লাগিল শ্মশানঘাটে—রূপে দেশ পূরি।

'কুঙ্কুম' দিয়েছি আগে সরলারে, সেই রাগে
অভিমানে মুখ ভার ক'রে থাকে ছুঁড়ী,
কখনো বা মোটা মোটা, আঁখি হ'তে পড়ে ফোঁটা,
কেলিকদমের মত দুই-দশ-কুড়ি!
মলিন ছায়ার মত, ম্রিয়মাণ অনুগত,
কভু সাজে 'কলাবউ' সেকালের বুড়ী,
তাই গো করিনু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান,
প্রেমদার পাদপদ্মে প্রেমের কস্তুরী।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সন
কলিকাতা

কবির দুঃখময় জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ব্যক্তির আশ্রয়ে, সাহচর্যে কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে শেরপুরের বিখ্যাত জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, মুক্তাগাছার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, নব্যভারত সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী, সৌরভ সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার ও ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালকমণ্ডলীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কবি এঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কবি তাঁর চন্দন কাব্যগ্রন্থটি "শ্রীযুক্তবাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের করকমলে" উৎসর্গ করেন। নব্যভারত পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কবির বিশেষ সুহৃদ ছিলেন। ১২৯০ সালে গোবিন্দচন্দ্র 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য' নামে একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশের জন্য পাঠান। নব্যভারত সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং নব্যভারত পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশ করেন। এই কবিতা প্রকাশকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত। কলকাতায় কবি কিছুদিন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'আনন্দ-আশ্রম'এ ছিলেন। কবির জীবিতকালে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থের উপহার কবিতায় কবি দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থের উপহার কবিতাটি ঃ—

উপহার

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে

সাপের গরলশ্বাসে, পাষাণের সহবাসে,
একে ত বিষাক্ততিক্ত কঠিন চন্দন,
তাহে আরো আস্ত কাঠ, নাহি রুচি নাহি ঠাট,
জমাট কুরুচি যেন বিকটদর্শন!
নাহিক আধার পাত্র, উলঙ্গ উন্মুক্ত গাত্র,
শিখেছে পশুর কাছে পশু-আচরণ,
এ সুসভ্য দেশে ভাই, কারে ইহা দিতে যাই,
শুনিলে সুরুচি দূরে করে পলায়ন!

তুমি হে শিবের মত, কালকূট কণ্ঠগত,
নির্ভীক নির্ম্মুক্তচিত্ত মহামৃত্যুঞ্জয়,
নিঃসহায়, নির্ব্বাসিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত,
সকলে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয়!
তাই হে তোমারে ভাই, এ চন্দন দিতে চাই,
তুমি না করিবে ঘৃণা নিশ্চয়—নিশ্চয় ;
স্নেহের নয়নজলে, ঘষিও হৃদয়তলে,
কুরুচি-কামলা রোগ এতে দূর হয়!

২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

সমস্যাসঙ্কুল জীবনের একটি অংশে গোবিন্দচন্দ্র জীবিকার সন্ধানে জন্মভূমি ছেড়ে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় উপস্থিত হন এবং মুক্তাগাছায় জমিদারি সেরেস্তায় দু বছর চাকরী করেন। এখানেই কবি দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর 'দেব নিবাস'এ আতিথ্য গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রকিশোর ছিলেন কবির গুণগ্রাহী এবং তাঁর মাধ্যমেই ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং গোবিন্দচন্দ্রের কবিখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কবি তাঁর রচিত 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থটি "সুহৃদ্বর শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়"কে উপহার দেন।

উপহার

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়

দেবেন্দ্র! দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি,
ত্রিদিব হইতে উচ্চ হৃদয় তোমার,
চিরবসন্তের উহা পুষ্প-রাজধানী,
চিরফুল্ল ও নন্দনে মমতা-মন্দার!

বহিছে অমৃত-গঙ্গা স্নেহকরুণার,
সিক্ত করি সদা প্রেম-কল্পতরুমূল,
দরিদ্রদুঃখীরা তব দেব-পরিবার,
অবিরত ভুঞ্জে তাহা আনন্দে আকুল!

আমার হৃদয় এক দগ্ধ চিতাভূমি,
তাহাতে ফুটিয়াছিল রক্ত-চিতাফুল,
তব যোগ্য নহে, তবু জান তাহা তুমি
ছিঁড়িয়া প্রেতিনী প্রেত করেছে নির্ম্মূল!

পিশাচে ফুকারি অস্থি বাজাইছে বেণু,
উড়ে তাই ছাইভস্মে হৃদি-ফুলরেণু!

২১শে ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

কবি তাঁর 'বৈজয়ন্তী' কাব্যগ্রন্থটি ''বিখ্যাত দয়াবান ও দাতা শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের'' করকমলে উৎসর্গ করেন। জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী ছিলেন মুক্তগাছার ভূম্যধিকারী। কবি তাঁর আশ্রয় ও জীবিকার বিষয়ে জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। 'বৈজয়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের উপহার কবিতায় আবেগতাড়িত কবি তাঁর ঋণ স্বীকার করেন। 'বৈজয়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের উপহার কবিতা ঃ—

উপহার

বিখ্যাত
দয়াবান্ ও দাতা
শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
মহাশয়ের করকমলে

মুক্তাগাছার মুক্তা তুমি, বঙ্গভূমির হীরা,
রাজারাণীর মাথার মণি, যশে জগৎ ঘিরা!
শশী রবি মলিন সবি মধুর পুণ্যালোকে,
সর্ব্বজয়া তোমার দয়া দুঃখে রোগে শোকে!
পিতৃহীনের পিতা তুমি মাতৃহীনের মাতা,
কাঙ্গাল গরীব আতুর অন্ধের অন্নবস্ত্র-দাতা!
হৃদয় ভরা স্নেহ দয়া, নয়ন ভরা জল,
জগৎ ভরা দানে কেবল শূন্য করতল!

ধন্য তুমি জন্মভূমির পুত্র পুণ্যবান,
বঙ্গভাষার ভরসা আশা সহায় সুমহান্!
হে সন্ন্যাসী রাজঋষি তোমার মত কেবা,
জনক রাজার মত কর জগৎবাসীর সেবা!
শ্রদ্ধাভরে ভক্তিভরে তোমায় নমস্কার,
কৃপা ক'রে গ্রহণ কর প্রীতির উপহাব!

১১ই ভাদ্র, ১৩১২ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

[দীপনির্বাণ (১৮৭৬), বসন্ত উৎসব (১৮৭৯), ছিন্নমুকুল (১৮৭৯), গাঁথা (১৮৮০), মিবার রাজ (১৮৮৭), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৮), নবকাহিনী (১৮৯২), স্নেহলতা (১৮৯২), ফুলের মালা (১৮৯৫), কাহাকে (১৮৯৮), কৌতুক নাট্য (১৯০১), দেব কৌতুক (১৯০৬), কনে-বদল (১৯০৬), রাজকন্যা (১৯১৩), নিবেদিতা (১৯১৭), যুগান্ত (১৯১৮), বিচিত্রা (১৯২০)]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যকার হিসাবে স্বর্ণকুমারী দেবী একজন ব্যতিক্রমী লেখিকা। সেই সময়ের মহিলা সাহিত্যকাররা ছিলেন মূলত কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। কিন্তু সাহিত্যের সর্বশাখায় স্বর্ণকুমারীর বিচরণ ছিল সাবলীল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব সম্ভবত ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরে। এই সময়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয়। পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করে কোন অজ্ঞাত কারণে দীপনির্বান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লেখকের কোন নাম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতে দীপানির্বাণ গ্রন্থটি পড়ে পরম প্রীত হলেন এবং লিখলেন, "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?" অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ দীপানির্বাণ গ্রন্থটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা বলে ভুল করেছিলেন। এই ভুলের প্রধান কারণ স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব ছিল অসামান্য।

স্বর্ণকুমারী তাঁর প্রথম উপন্যাস ও তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ দীপনির্বাণ উৎসর্গ করেন 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু'কে। স্বর্ণকুমারী বাল্যাবস্থা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ, মমতা, প্রশ্রয়ের অধিকারিণী ছিলেন। সহোদরা স্বর্ণকুমারী ছিলেন কুসংস্কার মুক্ত, স্বাধীনচেতা এবং শিক্ষিতা। এই কারণে সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ ভালাবাসাও বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

১৯১৫ খ্রীঃ 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্নেহের ভগিনী' কে 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' উৎসর্গ করেন 'তোমার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ'।

'দীপনির্বাণ' কবিতার উপহার কবিতাটি এইরূপ ঃ—

উপহার

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু

মেজদাদা।

উপহার সমর্পিনু সোহাগে যতনে
লহ হাসিমুখে নিরখিব সুখে
সে মধুর স্নেহহাস্য সদা জাগে মনে।
যে হাসি দেখিলে হৃদয়, সলিলে
ফুটিবে হরষপদ্ম অপূর্ব শোভায়,
হায় সে বিনোদ হাসি বড় সাধ যায়।
কিন্তু বা কেমনে কহি হাসিতে আবার?
আর্য-অবনতি কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার।
কেমনে হাসিতে বলি সকলি গিয়েছে চলি
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ ভেঙেছে কপাল।

১৮৭৯ খ্রীঃ প্রকাশিত 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যটি স্বর্ণকুমারী দেবী উৎসর্গ করেন 'ভাই বিহঙ্গিনি' কে। এই সম্বোধিত মহিলা হলেন এটর্নি কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী সুলেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরানী। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং শরৎকুমারীর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ছিল মধুর এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বর্ণকুমারী ও শরৎকুমারীর বন্ধুত্বের পাতানো সম্বন্ধের নাম বিহঙ্গিনি।

'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যের উপহার কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

উপহার পত্র

ভাই বিহঙ্গিনি,

সখি লো জনম ধরে ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে লো তার নিদর্শন—এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিনি—বিহগি আমার।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সাধনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনের সাহিত্য রচনায় স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার যথার্থ নিদর্শন দীপানির্বাণ উপন্যাসটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা বলে সত্যেন্দ্রনাথের ভুল ধারণা। স্বর্ণকুমারীর জীবনে ঠাকুরবাড়ির যে কয়েকজন তাঁর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অন্যতম। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রীতি ও শ্রদ্ধার নির্দশন স্বরূপ তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল' উৎসর্গ করেন 'পূজনীয়েষু জ্যোতিদাদা'কে।

উপহার কবিতাটি এইরূপ ঃ—

পূজনীয়েষু

জ্যোতিদাদা!

হৃদয় উচ্ছ্বাস ভরে, আজিকে তোমার করে
দলিত কুসুমকলি সঁপিনু যতনে,
কি আর চাহিতে পারি? এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি সনে।

রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারীর ছোটভাই রবির উপর ছিল অকুণ্ঠ স্নেহ ও ভালাবাসা। ঠাকুরবাড়িতে সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় এই দুই ভাই বোনই ছিলেন অগ্রগণ্য। সাহিত্যও সংগীত চর্চায় উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্বর্ণকুমারী তাঁর 'বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্যে আঠাশটি রবীন্দ্রসংগীত অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' কাব্যগ্রন্থ ১৮৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং দুরন্তভাই 'রবি' কে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই কাব্যগ্রন্থ স্বর্ণকুমারী দেবী উৎসর্গ করেন। বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যর কথায় "গাথা কাব্যের গাঁথা হার দিয়েই 'ছোট ভাইটি' কে কবি আশীর্বাদ করেছিলেন"। আশীর্বাদব্যঞ্জক এই উপহারপত্রটি নিম্নরূপ ঃ—

উপহার

ছোট ভাইটি আমার

যতনের গাথা হার, কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেনরে খেলার ভুলে, ছিঁড়িয়ে ফেলোনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই, —তাইতে ডরাই।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো গ্রন্থই স্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করেন নি।

অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রীতির কারণেই সত্যেন্দ্র পরিবারের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণকুমারী তাঁর 'মিবারবাজ' ঐতিহাসিক উপন্যাসটি সত্যেন্দ্র-তনয়া 'স্নেহময়ী ইন্দিরা'কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন ঃ—

উপহার

স্নেহময়ী ইন্দিরা,

তুই স্নেহময়ী, যেন বরষার ফুল
কোমল মাধুরী মাখা বিমল বকুল।
বিকশিত অশ্রুজলে, সুবাসিত শুষ্ক দলে
বিধাতার দিব্যসৃষ্টি অপূর্ব অতুল।
যে তোমার কাছে আসে জুড়াও মধুর বাসে
ক্ষুদ্র হৃদে উথলিত প্রণয়-আকুল।
যে যায় দলিত রেখে, সেও গন্ধ যায় মেখে
স্বরগের পুণ্য তুমি ধরণীর ভুল।
এনেছি এ শোক গীতি, তোমার পরশ প্রীতি
ফুটাবে বিরাগ মাঝে সুরাগ মুকুল।

১৮৬৭ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী ব্যারিস্টার জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। জানকীনাথ স্ত্রীর সাহিত্য রচনার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। নিজের সাহিত্যচর্চায় স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্বর্ণকুমারী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর রচিত 'হুগলীর ইমামবাড়ী', 'নবকাহিনী' এবং 'কাহাকে' গ্রন্থ তিনটি স্বামী জানকীনাথ ঘোষালকে উপহার দেন।

'হুগলীর ইমামবাড়ী' গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ ঃ—

উপহার

তোমায়,

সংসারের সুখদুঃখ, সংসারের হাসি,
সংসারের মোহমায়া ভালোবাসাবাসি,
এসব চাহনা কিছু উর্দ্ধে আছ তার,
করুণ-নয়নে তবু কেন অশ্রুধার।

ও অশ্রু নহে ত সুখে অভিনব আশ,
ও অশ্রু নহে ত তীব্র বাসনা-পিয়াস,
বিমল করুণা-ধারা ঐ অশ্রুজল,
দুঃখের জগতে করে আশীষ মঙ্গল,
ও করুণ আঁখি তুলে চাহ একবার,
জন্ম-জন্মান্তের স্মৃতি-জীবন মরণ প্রীতি—
এনেছি চরণে দেব, দিতে উপহার।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত ছোটগল্প সংকলন 'নবকাহিনী' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

উপহার

স্বামিন

সংসারের অন্ধকার ঝটিকা পীড়নে
যখনি কাতর দেহ, অবসন্ন প্রাণ,
প্রীতিদীপ্ত পুণ্যরূপে নয়ন ভরিয়া
দাঁড়াও সম্মুখে দেব, কর শান্তি দান।
প্রেমের পরশে তব দলিত হৃদয়,
নবীন জীবন লভে, ফুলে ফুলময়।
স্বর্গের প্রভাত তুমি প্রশান্ত বিমল।
বিধাতার মূর্ত্তিমান আশীষ মঙ্গল—
তোমারি প্রসাদ এ যে তোমারি কল্যাণ।
তোমারে করিনু আজি উপহার দান।

'কাহাকে' উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে ঃ

উপহাব

কাহাকে?

করুণা সে চাহে কৃতজ্ঞতা
ভালবাসা চাহে ভালবাসা ;
তবু প্রেম অতুল মহান,
শুধু দান নাহিক প্রত্যাশা।

নিস্কাম চরণে তব দেব,
প্রীতিময় এ পূজা, প্রণতি,—
স্বার্থপূর্ণ দীন সকামের
আত্মহারা বিস্ময়-ভকতি।

মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী স্বর্ণকুমারীর সখিসমিতি, মহিলা শিল্পাশ্রম, বিধবাশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনীর মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর বন্ধুত্বের পাতানো সম্পর্কের নাম ছিল মিলন-বিরহ। গিরীন্দ্রমোহিনীর বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের প্রতি লেখিকার সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ 'স্নেহলতা' সামাজিক উপন্যাসটি লেখিকা 'ভাই মিলন' কে উপহার দেন। উপহার কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

উপহার

ভাই মিলন,

সখেরে লভিবারে, দুখের হাহুতাশ!
হাসির ফাঁসে অশ্রু, আপনা চাহে নাশ!
আঁধার, আলো মাঝে, ডুবাতে চাহে প্রাণ!
বিরহ হ'তে চায়, মিলনে অবসান!
হায়! মিছে এ আঁকু-বাকু, মিছে এ যাচাযাচি!
ততই দূরে দূরে, যতই কাছাকাছি।
চাহিয়া দেখি আর, দেখিয়া মরি ভেবে,
আমার এই স্নেহ, কারে দেব কে নেবে?

সখি গো ফিরাও না, এনেছি তোরি তরে,
না হয় দিও ফেলে, আড়ালে কিছু পরে!

'ফুলের-মালা' উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। ছোট একটি কবিতার মাধ্যমে কবির অজ্ঞাতপরিচয় কোনো এক সখীকে বইটি কবি উপহার দেন।

উপহার

এ ফুলের মালাগাছি বহুদিন ধরে—
লুকান রয়েছে গাঁথা হৃদয়ের পরে।

আজ ধরিতেছি খুলি ছিন্নভিন্ন দলগুলি
অনাদরে লবে তমি—অথবা আদরে?

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ী দেবীর জন্ম ১৮৬৮ সালে। স্বর্ণকুমারী তাঁর 'কৌতুকনাট্য' (১৯০১) এবং 'বিচিত্রা' (১৯২০) গ্রন্থ দুটি তাঁর কন্যা 'স্নেহময়ী রানি'—হিরণ্ময়ী দেবীকে উৎসর্গ করেন।

'কৌতুক নাট্য' এর উৎসর্গের কবিতাটি এইরূপ ঃ—

উপহাব

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে—

ধর স্নেহ উপহার স্নেহময়ী রানি।
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা হীনগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ আমার যা বাণী,
সকলি তোমার কাছে আদরের জানি!

'বিচিত্রা' উপন্যাসের ক্ষুদ্র উপহার-পত্রটি এইরূপ ঃ—

উপহার

তোমারেই দিতে হবে? তাই লও বেশ!
দেখো যেন না পড়েই করিও না শেষ!
অত কেন হাসি রানি? বলো দেখি মনোবাণী
কার ছবিখানি এত দেখিছ সরেশ?

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেব কৌতুক' নাটকটির উৎসর্গপত্রটি কবির কোন এক পারিবারিক সুহৃদের বিবাহ উৎসবকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গীকৃত।

উপহার-পত্র

বিবাহ কৌতুক!
স্বপন-রতনে গাঁথা অপূর্ব যৌতুক!
নন্দন কুসুমহার আশীর্বাদ দেবতার, চিরফুল্ল গন্ধাকুল অনাদি কৌতুক।
পবিত্র উৎসব রাতি, লহ দোঁহে কণ্ঠ পাতি, এ বন্ধনে বসুমতী সুধন্য হউক।

'কনে বদল প্রহসন' ও 'যুগান্ত' কাব্যনাট্য গ্রন্থ দুটি পুত্র জ্যোৎস্নানাথকে উৎসর্গ করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। দুটি উপহার পত্রেই পুত্রের প্রতি মাতার উপদেশ ও আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। 'কনে বদল' গ্রন্থের উপহার পত্রটি এইরূপ :—

উপহার

বৎস,

কর কাজ চিরোৎসাহে, অশ্রান্ত অটল ;
ধন্য কর, ধন্য হও, সাধ সুমঙ্গল।
হাসিখুসী এ কৌতুক,
ক্ষণিকের খেলাটুক।
বিশ্রাম আরাম শুধু—শুধু নব বল।

'যুগান্ত' গ্রন্থের আশীর্বাদব্যঞ্জক উপহার-পত্রটি উদ্ধৃত হল :—

উপহার

বৎস,

তরুণ অরুণ তব মধুর আলোকে
অন্তর বাহির পূর্ণ আনন্দ পুলকে!
এমনি কল্যাণ ছটা বিতরিয়া তুমি
চিরধন্য হও, ধন্য কর জন্মভূমি।
মাতৃ হৃদয়ের এই আশীষ বচন
বরমাল্য দেবতার—কর হে ধারণ।

'রাজকন্যা' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে এটিকে একটি নাট্যোপন্যাস বলা হয়েছে। গ্রন্থটি দিদিমা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর দৌহিত্র ও দৌহিত্রী যথাক্রমে প্রসাদকুমার ও কল্যাণীকে উপহার দিয়েছেন। 'রাজকন্যা' নাটকের নায়িকার নামও কল্যাণী এবং নাটকে ধ্রুবকুমার নামে তার এক ভাইএর উপস্থিতি উপহার-পত্রটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

'রাজকন্যা' গ্রন্থের উপহার-পত্রটি উদ্ধৃতি করা হল :—

উপহার

এসো এসো ওগো প্রসাদকুমার,
এসো কল্যাণি, রূপসী বালা,

শোনাব একটি করুণ কাহিনী—
ছুটে এসো কাছে, রাখিয়ে খেলা।
তারো নাম ছিল কল্যাণী দেবী
রাজার মেয়ে সে, গরবী নয় ;
রূপ তোর মত অতটা না হোক
গুণে কিন্তু সেরা বলিতে হয়।
বড় হবে যবে দুটি ভাই বোনে
এমনি সত্যে রহিও ধ্রুব,
সার্থক হোক নাম তোমাদের—
এই দিদিমার আশিষ শুভ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নিবেদিতা' (একাঙ্কিকা) প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এই গ্রন্থটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীকে উৎসর্গীকৃত। সুনীতি দেবীর কন্যার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথের বিবাহ হয়। এই সূত্রেই স্বর্ণকুমারী ও সুনীতি প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হন।

'নিবেদিতা' গ্রন্থের উপহার পত্রটি এইরূপ ঃ—

উৎসর্গ পত্র

মহারানী শ্রীমতী সুনীতি দেবিকে ঃ—

হাসি অশ্রু দিয়ে গাঁথা, এই মালাগাছি
তোমাতে পরাতে হের সখি, আনিয়াছি।
এ নহে রতনগুচ্ছ হীরামুক্তরাশি—
বচন রচন তুচ্ছ, তবু ধর হাসি।
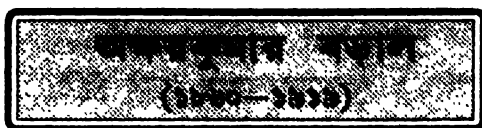
[প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫),
ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ (১৯১০), এষা (১৯১২)]

অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্র সমসাময়িক সময়ের একজন জনপ্রিয় কবি। কবি বিহারীলালের কাছে কাব্যে দীক্ষিত অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রদীপ, কনকাঞ্জলি ও ভুল বিহারীলালের জীবিত কালেই রচিত হয়। বিহারীলালের মৃত্যুর পর কাব্যগ্রন্থ শঙ্খ এবং এষা প্রকাশিত হয়।

বড়াল কবি তাঁর 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখ কবিদের মতো অক্ষয়কুমারও ছাত্রাবস্থাতেই বিহারীলালের অনুরাগী হয়ে পড়েন। অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের কাব্যশিষ্য ছিলেন। বড়াল কবি তাঁর কনকাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালে। ১৮৯৪ সালে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর কনকাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণে উৎসর্গের কবিতাটি সংযোজিত হয়। উৎসর্গের কবিতায় অক্ষয়কুমার বিহারীলালকে 'গুরু' অভিধায় সম্বোধিত করেছেন। কনকাঞ্জলির দীর্ঘ উৎসর্গের কবিতায় অক্ষয়কুমারের গুরুবন্দনা প্রকাশিত হয়েছে।

উৎসর্গ

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন-মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল সুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি',
কুহরিল ধীরে ধীরে ;
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি' স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি'
রহে জাগি নিশিদিন?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গ-সুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,—
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে।
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে!

যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর ;

বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
  কি নিষ্কাম প্রেমপথ!
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির,
দলি' পদে পর-মত।

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির-সুধা রস ;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
  নারী কত মহীয়সী!
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
  ভাষা কিবা গরীয়সী।

বুঝায়েছ তুমি,—কোথা সুখ মিলে-
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
  নাহি থাকে আত্ম-পর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
  পদে লুটে চরাচর।

বুঝায়েছ তুমি,—ছন্দের বিভবে ;
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ;
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
  কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি'!
ধন জন মান যার হয় হবে—
  তুমি চির-স্বপ্নে জাগি।'

তাই হোক, হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে—
রাজহংস সম, চির কলস্বনে,
  পক্ষ দুটী প্রসারিয়া ;

করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহরস পিয়া।

তাই হোক, হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক!
জগতে থাকুক জগতের দুখ,
জগতের বিসংবাদ ;
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।

তাই হোক, হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে!
দেখুক প্রেমিক,—সুগভীর যামে,
স্বপনে জগৎ ঢাকি'
নামিছে অমরী, ওই সুর ধরি',
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

তাই হোক, হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
কবি-জনমের হাহা!
লও—লও, গুরু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা!

বড়াল কবি তাঁর 'ভুল' কাব্যগ্রন্থটি একটি সুদীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ে সতীর্থ। উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধের বর্ণনা 'ভুল' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে।

রবিবার
১০ই শ্রাবণ', ৯৩ সাল।

উপহার

ববি,

এই জগতের দূরে—
যেন কোন্ মেঘ-পুরে,
তুমি আমি—দুই জনে বেড়াতাম খেলিয়া!
হাতেতে দুলিছে বাঁশী,
ঠোঁটে উছলিছে হাসি,
চারি দিক-পানে চেয়ে, চারি দিকে ভুলিয়া,
তুমি আমি—দুই জনে বেড়াতাম খেলিয়া।

পুঞ্জ পুঞ্জ তারা-ফুল,
সৌন্দর্য্য-কিরণাকুল,
চেয়ে র'ত মুখ-পানে, চারি দিকে ছাইয়া!
ইন্দ্রধনু পাখা মেলি,
কত মেঘ খেলি—খেলি,
লুটায়ে পড়িত পায়ে, ধীরে ধীরে গাইয়া!
চেয়ে র'ত মুখ-পানে, চারি দিকে ছাইয়া!

চমক-চাহনি-ভরা,
শিহরিত-কলেবরা,
সমুখেতে মন্দাকিনী কূলে কূলে উছলি,—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত আশা,
কত ভুল, ভালবাসা,
এঁকে যেত, ভেঙে যেত, ফুটে কিছু না বলি।
—সমুখেতে মন্দাকিনী কূলে কূলে উছলি।

শীতল দখিণা বায়,
কূলে কূলে, কুঞ্জ-ছায়,
বিভলে ঘুমাত পড়ি, পরিমল আলসে।
কখন বাঁশীর সুরে
কেঁদে কেঁদে যেত দূরে!
কখন আসিত কাছে, দুলে দুলে লালসে!
—বিভলে ঘুমাতে পড়ি, পরিমল আলসে।

ঝরিত' মন্দার-ফুল,
গাহিত বিহগ-কুল,
ফুল-মালা-ল'য়ে করে বলিকারা আসিত ;
হাসিয়া পরাতে এসে,
সরমে দাঁড়াত শেষে!
কেড়ে না পরিলে গলে, আঁখি-জলে ভাসিত!
যেতে যেতে—ফিরে-যেতে, বালিকারা আসিত!

কুজ্ঝটি-দিগন্ত দূরে—
সুমেরু-কনক-চূড়ে,
ঘুম্ ঘুম্ দেহে ঊষা কত খেলা খেলিত!
চন্দ্রমা, কুমেরু-কোলে
পড়িতে পড়িতে ঢ'লে,
মেঘ ঢেকে, মেঘ খুলে, কত স্বপ্ন তুলিত!
ঘুম্ ঘুম্ দেহে ঊষা কত খেলা খেলিত।

আমরা, কল্পনা-ভরে
মেঘে বাঁধিতাম ঘরে,
কখন বা ধরা পরে থাকিতাম চাইয়া!
গ্রহ, উপগ্রহে কত,
গড়ি জন্ম-ভবিষ্যত,
কহিতাম কত কথা,—রহিব কি লইয়া!
নীল, পীত, ধূম্র, শীত—কত গ্রহে চাইয়া!

কখন বা ক্রীড়াচ্ছলে,
কল্পনা-মন্দার-তলে
হারাতাম পরস্পরে, পরস্পরে সাধিয়া!
এ ওর শুনিছে রব,
ওর এ বুঝিছে সব,
মিলিতে মেলে না পথ, ভ্রান্ত হ'তে কাঁদিয়া
হারাতাম পরস্পরে, পরস্পরে সাধিয়া!

কভু, অভিমান খুঁজে,
কত ভেঙে, কত বুঝে,
নিরাশা-অলকা-জলে ডুবিতাম উভয়ে!
—চোখে চোখে চাওয়া-চাহি!
উচ্চ হাসি, নাওয়া-নাহি,
ভাসা মালা ধবাধরি, জড়াজড়ি সভয়ে,
নিরাশা-অলকা-জলে ডুবে ডুবে উভয়ে!

কখন বা করি ভুল
তুলিতে প্রণয়-ফুল,
পদ্ম-বনে, ফুল-বনে ছাড়াছাড়ি দুজনে।
আবার, ফিরিয়া এসে
মিলন, কবিতা-শেষে।
অশ্রু-জল মোছামুছি পথ ধারে বিজনে।
পদ্ম-বনে, ফুল-বনে ছাড়াছাড়ি দুজনে।

কভু, আঁখি-পানে এঁচে,
কে কি কথা চেপে গেছে—
জানিতে করিতে অন্যে ঘুমাইতে সাধনা!
জাগ্রতে যা সুধু খোঁজা,
স্বপনে তা যাবে বোঝা!
স্বপ্ন-অন্তে চাওয়া-চাহি সরমের বেদনা!
কভু আঁখি পানে এঁচে, ঘুমাইতে সাধনা।

তার পর, কোন্ দিকে—
মনেতে পড়ে না ঠিকে,
সময়ে—কল্পনা সত্যে গেছে এক হইয়া,
কোন্ এক বর্ষা-রাতে,
কি কবিতা ল'য়ে সাথে,
কি কাব্যে চলিয়া গেলে, কি নায়িকা পাইয়া!
সময়ে—কল্পনা সত্যে গেছে এক হইয়া।

একেলা—একেলা, হায়,
পড়িয়া কুটীর-ছায়,
একেলা আকাশ-পানে থাকিতাম চাহিয়া!
বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্,
হুহুহু বায়ুর স্বর,
ছোটে নদী তর্ তর্, তরী যায় বহিয়া!
একেলা আকাশ-পানে থাকিতাম চাহিয়া।

হাসিতে আসে না হাসি,
সে খেয়ালে বাসাবাসি!
হৃদয়ে বাসনা নাই, কবিতার কল্পনা!
সুরেতে বাজে না বাঁশী,
ফুলে নাই মধু-রাশি,
নিদ্রায় স্বপন নাই, জাগরণ যন্ত্রণা!
হৃদয়ে বাসনা নাই, কবিতায় কল্পনা।

রবি, শশি, তারা ব্যোম,
শুক্র, শনি, বুধ, সোম,
ধূমকেতু মত খুঁজে—গ্রহে গ্রহে মরিয়া,
আজ, আহা কত দূরে,
কত কল্প ফিরে-ঘুরে,
এক গ্রহে পৌঁছিয়াছি সুর-রেখা ধরিয়া!
ধূমকেতু মত খুঁজে—গ্রহে গ্রহে মরিয়া।

দেখিয়াছি মহাকাশে,
পরমাণু মহোল্লাসে
ব্রহ্মাণ্ড রেখেছে ছেয়ে, ছড়াইয়া আপনে।
দেখিতেছি এই দূরে—
কি সুর বাঁশীতে পূরে
সংসার রেখেছে ছেয়ে প্রেমে, গানে, স্বপনে!
জগত রেখেছে ছেয়ে, ছড়াইয়া আপনে!

তারার কিরণে তারা
কাঁপিছে অবশ-পারা!
মেঘের উপরে মেঘ পড়িতেছে ঘুমিয়া!
অলস তটিনী-কায়
মিশিছে সাগর-গায়
সমীর মূর্চ্ছিত প্রায়, যুথিবন চুমিয়া!
মেঘের উপরে মেঘ পড়িতেছে ঘুমিয়া!

তবে, সখা, ধর 'ভুল'!
তটিনীর কুল্ কুল্
ছুটিছে তোমারি দিকে, এ যে পূর্ব্ব-বাহিনী
ধর এ কুসুম-বাস,
বনের নীরব শ্বাস,
অস্ফুট বিহগ-গান, হৃদি-ভাঙা কাহিনী!
ছুটিছে তোমারি দিকে, এ যে পূর্ব্ব-বাহিনী।

অচেনা জগত-বুকে,
অবরুদ্ধ সুখে-সুখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া!
না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব,
আপনার ভাবে মত্ত,
ফেলেছি, ঝটিকা মত, না জানি কি ভুলিয়া!
রবি, এও কি হ'য়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া?

অক্ষয়কুমার বড়াল 'শঙ্খ' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু শ্রী প্রমথচন্দ্র করকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই উৎসর্গের কবিতায় ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে বর্ষার একটি সুন্দর উপমা পাওয়া যায়।

উপহার

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর
করকমলেষু

সে দিন—বর্ষার দিন, অতীব দুর্দ্দিন।
অতি অন্ধকার ধরা,
আকাশ জলদে ভরা,
ঝরিছে মুষল-ধারা—বিশ্রাম-বিহীন ;
বিজলী জ্বলিয়া উঠে,
কড়-কড় বজ্র ছুটে,
আছাড়ে করকা-শিলা—ধ্বংস সম্মুখীন!
দাপটে ঝাপটে বায়ু
ছিঁড়িছে বিশ্বের স্নায়ু—
পিচ্ছিল গন্তব্য-পথ, কর্ত্তব্য কঠিন।

ভীষণ অদৃষ্ট-রণ—সম্মুখে বিনাশ!
ফিরে' চাই ধরা পানে—
আঁধার ভ্রূকুটী হানে,
ঝটিকা ঝাপটে আনে তীক্ষ্ণ উপহাস।
আকাশের পানে চাই—
দেবতার চিহ্ন নাই,
কুণ্ডলিছে অন্ধকার—গাঢ় নিরাশ্বাস।
পদে পদে উঠি পড়ি,
দেখি—তুমি করে ধরি'
দিতেছ হৃদয় ভরি' মমতা বিশ্বাস।

বিগত বরষা ; আজ তুফানের শেষে
এনেছি এ হৃদি-শঙ্খ,
(থাক্ বালু, থাক্ পঙ্ক ;)
আগ্রহে কম্পিত-বক্ষে—বড় ভালবেসে!
আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন—
সে যে জীবনের ঋণ!
স্মরিয়া বিগত দিন—লও, ভাই, হেসে।
সৌভাগ্য-সম্পদ সহ
তার স্নেহাশিস্ লহ—
দেবতায় অহরহ
ডেকেছিল যে তোমার মঙ্গল-উদ্দেশে।

বড়াল কবির 'প্রদীপ' এবং 'এষা' কাব্যগ্রন্থ দুটি যথাক্রমে ১২৯০ সালে এবং ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'এষা' কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। কবির স্ত্রী বিয়োগ হয় ১৩১৩ সালের ১৯শে মাঘ। 'প্রদীপ' এবং 'এষা' কাব্যগ্রন্থ দুটি কবি তাঁর স্ত্রীকে উৎসর্গ করেন। স্ত্রীর বিয়োগব্যথায় শোকাতুর কবি যে কবিতাবলী রচনা করেন 'এষা' কাব্যগ্রন্থে সেই কবিতাবলীই প্রকাশিত হয়েছে। 'এষা'র উৎসর্গ কবিতায় পরলোকগতা স্ত্রীর গার্হস্থ্য জীবনের মধুর স্মৃতি, তাঁর পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের ছবিই বিদ্যমান।

উপহার

আবার—আবার—
ল'য়ে সেই দিব্য দেহ,
সে অতৃপ্ত প্রেম-স্নেহ,
আসিছ—ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার।
হাসি-হাসি মুখখানি,
সরমে সরে না বাণী,
আঁচলে নয়ন, রাণী, মুছি' বার বার।

কত যুগ-যুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোনার সংসার।
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা,
জীবন-মরণ-হরা,
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু'জনার!

বৈতরণী-তীরে বসি'
মরণের তরে শ্বসি—
আশা-তৃষ্ণা-হীন বৃদ্ধ—রুদ্ধ-অশ্রুভার ;
তুমি কেন, পৌর্ণমাসী,
আবার উদিছ আসি'
দুঃখ-শিরে-শিরে করি' কৌমুদী-বিস্তার!

প্রেমের কুহক-মন্ত্রে
কি বাজাবে ভাঙ্গা যন্ত্রে?
বুঝি না এ ছিন্ন তন্ত্রে কি বাজিবে আর!
আছি কি জীবন নিয়ে—
তুমি বুঝিবে না, প্রিয়ে,
আপনি ভাবি না ভয়ে কথা আপনার!

কেন আঁখি ছল-ছল্?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য—রসাতল।
ঝরিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার।
আবার যে প্রেমোচ্ছ্বাসে
শত প্রাণ ছুটে আসে।
ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্ত্বনার!

তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে।

চল—চল নিজ গৃহে,—দূর-মেঘপার!
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি—কোন্ দিকে!
জীবনে—মরণে আমি তোমার—তোমার!

কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ'-এর উৎসর্গপত্র ঃ—

উপহার

গীত-অবশেষে নিঃশ্বসিল কবি,
বল কি গায়িব আব—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি-তার!

চিত্র-অবশেষে সজল-নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে,
জীবন বৃথায় যায়!

প্রিয়ার সম্ভাষে বিহ্বল প্রেমিক,
এ কি অদৃষ্টের ছলা—
কত ভেবেছিল, কত বুঝেছিল,
কিছুই হ'ল না বলা!

[ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), মানসী (১৮৯০), বিসর্জন (১৮৯০), ক্ষণিকা (১৯০০), কথা (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতালি (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬), মহুয়া (১৯২৯), পরিশেষ (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), খাপছাড়া (১৯৩৭), সে (১৯৩৭), সেঁজুতি (১৯৩৮), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১) এবং গল্পসল্প (১৯৪১)]

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ উৎসর্গ কোন নির্দিষ্ট নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল না। তিনি কোনো গ্রন্থে এক ছত্রে, কোথাও বা একাধিক ছত্রে আবার কোথাও শুধুমাত্র সম্পর্কের সম্বোধনের মাধ্যমে উৎসর্গ পর্ব সমাধা করেছেন। অনেক গ্রন্থে ব্যক্তির নাম অনুক্ত রেখে একটি কবিতায় গ্রন্থ-উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধ্যমে গ্রন্থ-উৎসর্গের বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র কবির নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকেই সর্বাধিকসংখ্যক গ্রন্থ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে উৎসর্গ করেছেন। কাদম্বরী দেবীর জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যাসংগীত, বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩) প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), ছবি ও গান, এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শৈশব সংগীত (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৫) উৎসর্গ করেন। এতগুলি গ্রন্থ একজন লেখক কোন নির্দিষ্ট একজনকেই উৎসর্গ করেছেন, এর নজির বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবত বিরল।

কাদম্বরী দেবী ঠাকুর পরিবারে যখন বধূ হয়ে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স নয় বৎসর এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল সাত বৎসর। মা সারদাদেবীর অসুস্থতার কারণে বালক রবীন্দ্রনাথ সহ পরিবারের অন্যান্য বালকদের দেখাশোনার ভার পড়েছিল কাদম্বরী দেবীর উপর। নতুন বৌঠানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত সে সময় থেকেই। কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেকখানি স্থান অধিকার করে ছিলেন। কবির 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থ দুটিতে একাধিক

স্থানে কাদম্বরী দেবীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। 'জীবনস্মৃতি' তে কবি লিখেছেন, "সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খণ্ড) তে লিখেছেন—"নয় বৎসর বয়সে বালিকা বধূরূপে তিনি যখন এই গৃহে প্রবেশ করেন তখন সাত বৎসরের বালক রবি ছিল তাঁহার খেলার সাথী, গল্পের সঙ্গী, চৌদ্দ বৎসর তাহাকে নিরন্তর পাইয়াছিলেন। স্বভাবকোমল নারী হৃদয়ের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা রবিকে ঘিরিয়া সার্থক হইয়াছিল।"

কাদম্বরী দেবী লোকন্তরিত হন ৮ বৈশাখ, ১২৯১। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল তার পরিচয় 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।" "আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কি আছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্যটি উৎসর্গ করেন কবিতার মাধ্যমে। 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হবার সময় যে উপহারের কবিতাটি ছিল, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের 'ধ্রুবতারা', গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় উপহার কবিতাটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। কবি এই নাট্যকাব্যটি উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী হে-কে। গ্রন্থ উৎসর্গের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। সম্পূর্ণ নাম প্রকাশ না করে কেবলমাত্র নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করা। কে এই শ্রীমতী হে? এ সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার লিখেছেন "আমরা ইন্দিরা দেবীর নিকট শুনিয়াছি 'হে' কাদম্বরী দেবীর কোন ছদ্মনামের আদ্যক্ষর। তাঁহার ডাক নাম ছিল 'হেকেটি'। ইনি প্রাচীন গ্রীকদের ত্রিমুণ্ডী দেবী ; অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে ডাকিতেন।" কাদম্বরী দেবীকে এভাবে সরাসরি কবিতায় উপহার লিখে বই উৎসর্গ করার সাহস কোথা থেকে পেলেন কবি? রবীন্দ্রজীবনীকারের কথা—"কবিকাহিনীর খসড়া তৈরীর সময় ঐ কাব্যের নাম ভগ্নহৃদয় দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; কিন্তু মুদ্রণকালে ভয়ে ভয়ে সে নাম ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিলাতে গিয়া যে প্রগল্‌ভতা লেখনী মাধ্যমে গদ্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল,

সেই দুঃসাহসিক মনোভাব হইতে 'ভগ্নহৃদয়' লিখিতে ও ভারতীতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই দুঃসাহাসিক আধুনিক মনোভাব হইতে কাব্যখানি উৎসর্গ করিলেন শ্রীমতী হে-কে। অথচ শ্রীমতী হে-কে তাহা বাহিরের লোক না জানিলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অজানা ছিল না।" রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তাকে ডাকিলাম
একদিন ঘুচে গেল ভয়
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা বিনিময়।"

(শ্যামা—আকাশপ্রদীপ কাব্যগ্রন্থ)

উপহার

শ্রীমতী হে——————

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক, শুকায়ে শুকায়ে যাক,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়।
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়।

২

জীবনসমুদ্রে তব জীবনতটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া—
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরামে পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে।
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে।

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—
ফুরাইবে গীত গান অবসাদে ম্রিয়মাণ
সুখ শান্তি অবসান—কাঁদিব আধারে বসি।

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিও দান
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান?

সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। কাব্যগ্রন্থটির প্রারম্ভে কোন উপহার পত্র বা উৎসর্গপত্র সংযোজিত না থাকলেও গ্রন্থের পরিশেষে মুদ্রিত 'উপহার' কবিতাটি থেকে যায়, কবি কাদম্বরী দেবীকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন।

উপহার

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কখনো গাও নি তুমি কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবীরাগিণী-তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

বলো দেখি কতদিন
আস নি এ শূন্য প্রাণে।
বলো দেখি কতদিন
চাও নি হৃদয়পানে,

বলো দেখি কতদিন
শোনো নি এ মোর গান—
তবে সখী গান-গাওয়া
হল বুঝি অবসান।

যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে?
তার সাথে মিলিছে না সুব?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান—
তাই সখী, রয়েছ কি দূর?
ভালো সখী, আবার শিখাও,
আরবার মুখপানে চাও,
একবার ফেলো অশ্রুজল,
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি।
তা হলে পুরানো সুর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি।
সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী,
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির।
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী,
শূন্য আছে প্রাণের কুটির।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থটিতে একটি উৎসর্গপত্র সংযোজিত থাকলেও উৎসর্গকারী বা উৎসর্গের উদ্দিষ্ট-জনের নাম প্রকাশ করা হয়নি। "যাহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি ফুটিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" কাব্যটি নিঃসন্দেহে কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গীকৃত।

উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার
বসন্তে মালা গাঁথিলাম!
যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি
একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত,
তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথের মানস গঠন ও সৃষ্টিশীল জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর ভূমিকা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বাল্যকাল থেকেই জ্যোতিদাদা ও বউঠাকরুন রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিলেন এক ও অভিন্ন। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে, নিজের জীবনে জ্যোতিদাদার ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় পূর্ণ একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁর 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটি ভাই জ্যোতিদাদাকেক উৎসর্গ করেন। এ প্রসঙ্গে, উৎসর্গ কবিতাটির 'যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই' 'অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথে', 'কঠোর সংসার হতে আবরি রেখেছ মোরে' পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের থেকে বারো বছরের বড় ছিলেন। সাহিত্যচর্চা ও মননে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে সঙ্গ ও সহায়তা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে অকপটে স্বীকার করেছেন।

"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি আমাকে খুব একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিত না।...জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে..."। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলায়' লিখেছেন,—"জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম্ সুর তৈরী করে যেতেন ; আমাকে রাখতেন পাশে। তখন-তখনই সেই ছুটে চলা সুরে কথা

বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান সংযোজিত হয়েছে। 'মানময়ী' নাটকে 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি' এবং 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' নাটকে 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ', রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা', 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় অনেকগুলি গানে সুর আরোপ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অশ্রুমতী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'রুদ্রচণ্ড' ছাড়াও তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) গ্রন্থটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ উৎসর্গ প্রয়াস। 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটির উৎসর্গের কবিতাটি এইরূপ ঃ—

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই।
আগ্রহে অধীর হ'য়ে   ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ
দেখাতে পারিলে তাহা পুরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালোবাসি, তার মতো কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই।

সৌদামিনী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি। মহর্ষির আটপুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে সৌদামিনী দেবী পঞ্চম সন্তান ও জ্যেষ্ঠা কন্যা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' উৎসর্গ করেন বড়দিদি 'শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু' কে। 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' প্রথম গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯

সালে। সৌদামিনী দেবীর বয়স তখন ৩৫, রবীন্দ্রনাথের ২২।

সৌদিমিনী দেবী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাকে সঙ্গে নিয়ে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শেষদিকে কানারায় সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে গিয়ে প্রায় এক বছর অতিবাহিত করে কলকাতায় ফিরে আসেন। যখন তাঁর বাড়ি ফিরে আসার খবর পাওয়া গেল তখন সেই আনন্দ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই উপহার কবিতাটি লিখে উপন্যাসটি স্নেহময়ী বড়দিদিকে উৎসর্গ করেন। কবিতাটিতে বড়দিদির স্নেহপ্রবণ চরিত্রটি খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আবার দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পরে বড়দিদিকে কাছে পাওয়ায় কবির হৃদয়ের আনন্দও কবিতাটিতে প্রকাশিত। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ বড়দিদির অগাধ স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তারই অকপট স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটেছে 'বৌ ঠাকুরানীর হাট'এর উৎসর্গের কবিতায়।

উপহার

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
শ্রীচরণেষু

দিদি,

তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত মুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।
কাছে থাকি দূরে থাকি দেখ আর নাহি দেখ
শুধু স্নেহ দাও।
স্নেহ করে ভালো থাক স্নেহ দিতে ভালোবাস
কিছু নাহি চাও।
দূরে থেকে কাছে থাক আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়,
সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।

এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
স্নেহপারাবার—
প্রভাতশিশিরসম নীরবে পরানে মম
ঝরে স্নেহধার।
তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়—
নীরবে বিমল হাসি উষার কিরণরাশি
প্রাণেরে জাগায়।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের বৈশাখে (মে, ১৮৮৩)। 'প্রভাত সংগীত' কাব্যগ্রন্থ কবি উৎসর্গ করেন ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরাকে। রবীন্দ্র অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানাদানন্দিনীর কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় বিলাতে ব্রাইটন শহরে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে। ইন্দিরার বয়স তখন ৫ বছর এবং ভ্রাতুস্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বয়স ৬। সে সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরার মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়, অতি কাছের। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সহধর্মিনী।

অজস্র চিঠি লিখেছেন কবি তাঁকে। কবির চিঠি প্রাপকদের তালিকায় ইন্দিরা দেবীর নাম বোধহয় শীর্ষে। ১৮৮০ তে কবির লেখা ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রের অংশবিশেষ—"আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর-সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি—সেগুলি বোধহয় তোর চিঠির বাক্সের মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে।" (ছিন্নপত্র, সংযোজন, ২য় সং.)

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে 'মঙ্গল গীত' শীর্ষ নামে তিনটি দীর্ঘ কবিতা আছে। তিনটি কবিতার উপরে লেখা আছে—'শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক। কবিতাগুলিতে ইন্দিরা দেবীর মঙ্গল কামনা ব্যক্ত হয়েছে।

সাহিত্য বিষয়ে ইন্দিরার জ্ঞানের প্রতি কবির ছিল অগাধ আস্থা। ইন্দিরা দেবী ইংরাজি ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কথা ইন্দিরা

দেবী ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। 'রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' ইন্দিরা দেবীর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে ঃ

স্নেহের উপহার
শ্রীমতী ইন্দিরা—
প্রাণাধিকাসু

বাব্‌লা!
আয়রে বাছা কোলে বসে চা মোর মুখ পানে,
হাসি-খুশী প্রাণখানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস্ ছুটে, আমায় বাসিস, ভালো,
কোথা হ'তে পড়লি প্রাণে তুই রে উষার আলো।
দেখ্‌রে, প্রাণে স্নেহের মতো, শাদা শাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখ্‌রে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেঁথেছিরে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড় সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভালো,
আয়রে তবে আয়রে মেয়ে দেখরে চেয়ে রাত পোহালো!
কচি মুখটি ঘিরে দেব ললিত রাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আসবি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়ে. চড়ে।
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর, ভাঙা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোট দুটি হাত দিয়ে তোর, গলাটি মোর ধর জড়িয়ে!
বিজন প্রাণের দ্বারে ব'সে করবিরে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস সাড়া দেবে, বুকের কাছে আয়রে তবে,
তোর মুখের গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে!

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাব্‌লা গাছের মতো,
বড় বড় কাঁটার ভয়ে তফাৎ থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখি,
(আমার) কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থকি।
নেইবা লতা এল কাছে বাব্‌লা ফুলটি বসল শাখে,
যদি আমার বুকেব কাছে বাব্‌লা ফুলটি ফুটে থাকে।
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয়রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেল্লেম কত কি যে?
কথাগুলো ঠেক্‌চে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে!

রবি কাকা

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয়েছিল ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০। সে সময় কবির বয়স ২২ বৎসর, মৃণালিনী দেবীর ১১। মৃণালিনী দেবীর পিতৃদত্ত নাম ছিল ভবতারিণী। বিবাহের পরে ভবতারিণী হলেন মৃণালিনী। ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির অপরিচিত পরিবেশে ভবতারিণীর নবজন্ম হল মৃনালিনী রূপে। বিবাহের পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অগ্রসর না হলেও বিবাহের পরে মহর্ষি অগ্রণী হয়ে মৃণালিনী দেবীর আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন এবং লরেটো হাউসে পড়বার অনুমতি দান করেন। যদিও স্বল্পকাল পরেই পারিবারিক বিভিন্ন কারণে সে শিক্ষায় কার্যত ছেদ পড়েছিল।

কবির একবার ইচ্ছা হল পশ্চিমের কোনো রমণীয়স্থানে অবস্থান করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে কবিজীবন সফল করার। স্থান নির্বাচিত হল গাজিপুর। স্থান নির্বাচনের বিষয়ে কবি লিখেছেন, "বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।...শুনেছিলুম, গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত।...তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।" ১২৯৪ সালের শেষদিকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা বেলাকে নিয়ে গাজিপুরে সংসার রচনা করলেন কবি। পাঁচ মাস স্থায়ী এই সংসারে কবিপত্নী একান্ত নিজের মতো করে লাভ করলেন তাঁর স্বামীকে। "পক্ষান্তরে যৌবনের পরিপূর্ণতায় কবিও এখন প্রথম পাইলেন পত্নীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে, প্রণয়িনীরূপে।" (মৃণালিনী দেবী—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। "আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে, গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে ছোটবউ, ভাই ছোটবউ, ছুটি প্রভৃতি অন্তরঙ্গ নামে সম্বোধন করেছেন চিঠিপত্রে। "কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চকণ্ঠে 'ছোট বউ, ছোট বউ' করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন।"

(কবিপ্রিয়া—উর্মিলা দেবী)।

কবি ভোজনপ্রিয় ছিলেন না, অত্যন্ত ভোজনরসিক ছিলেন। "রন্ধনরত পত্নীর পার্শ্বে মোড়ায় বসিয়া তিনি নূতন রকমের রান্নার ফরমাস করিতেন, মাল-মশলা দিয়া নূতন প্রণালীতে পত্নীকে রান্না শিখাইয়া শখ মিটাইতেন এবং শিখানোর জন্য গৌরব করিয়া বলিতেন—"দেখলে তোমাদেরই কাজ, তোমাদের কেমন এই একটা শিখিয়ে দিলুম"। কবিপত্নী হার মানার ভাষায় মৃদুস্বরে বলিতেন—"তোমাদের সঙ্গে পারবে কে। জিতেই আছ সকল বিষয়ে।" (মৃণালিনী দেবী—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

গতানুগতিক বিদ্যালয় প্রথার শিক্ষালাভে কবির সমর্থন কোনদিনই ছিল না। তাই আদর্শ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ আদর্শ বিদ্যালয়—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণেরও দিন। এই কারণে ৭ই পৌষ দিনটি মহর্ষি এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাছেই ঐতিহাসিক ভাবে স্মরণীয় দিন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় কবির বিশেষ অর্থাভাব ছিল। এই সময় তিনি পুরীতে তাঁর বাড়ি বিক্রয় করেন। অলংকার বিক্রয় করে মৃণালিনী দেবী বিদ্যালয় পরিচালনায় কবির সহায়তা করেছিলেন। সহধর্মিনী মৃণালিনী তখন কবির সহকর্মিনী হয়েছিলেন। ছাত্রদের জলখাবার তৈরীর ভার নিজ হাতে নিয়েছিলেন মৃণালিনী দেবী। মাতৃস্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন আশ্রমের ছাত্রদলকে।

কবিকে খুশি করার প্রেরণা থেকেই মৃনালিনী দেবী রাজা ও রানী-নাটকে নারায়ণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই নাটকে কবি বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই মৃণালিনী দেবীর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক রোগে পরিণত হল। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। প্রায় দু মাস মৃণালিনী দেবী শয্যাশায়িনী ছিলেন। এই সময়ে কবি নিজে সম্পূর্ণভাবে পত্নীর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 'বৈদ্যুতিক পাখা তখন ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিনীর রোগজ্বালা প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন। ১৩০৯ সালের ৭

অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রে মৃণালিনী দেবীর জীবনাবসান হয়। কবির 'ধরার সঙ্গিনী'র সঙ্গ সাঙ্গ হল।

কবি ও মৃণালিনী দেবীর দাম্পত্যজীবন ১৯ বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। পত্নী স্মরণে রচিত 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে কবির সন্তাপগ্রস্ত কাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। "গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে? /এঘব হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?/বিশ-বৎসরের তব সুখ-দুঃখ ভার/ফেলি রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।"

মৃণালিনী দেবী ছিলেন কবিব মানসপ্রতিমা। আর তাই কবি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় তাঁকে নামহীনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'মানসী' ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থটি মৃণালিনী দেবীকে উৎসর্গীকৃত। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতার ছত্রে মৃণালিনী দেবীকে অনেকটাই বুঝতে পারা যায়। "ছাড়ি অন্তপুরবাসে/সলজ্জ চরণে আসে/মূর্তিমতী-মর্মের কামনা।/অন্তরে বাহিরে সেই/ব্যাকুলিত মিলনেই/কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস/সেই আনন্দ মুহূর্তগুলি/তব করে দিনু তুলি/সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।"

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের উপহাব পত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর—
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমেব সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
সেই আনন্দমুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

জোড়াসাঁকো
৩০ বৈশাখ ১৮৯০ (খৃষ্টাব্দ)

রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র 'শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু' কে একটি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন। ২৬ জুলাই, ১৮৭২ তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ পুনায় জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে ইংল্যান্ডের ব্রাইটন শহরে ছিলেন, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরার প্রথম পরিচয় হয়। সেখানেই এই ভাইপো-ভাইঝিকে খুব কাছের থেকে নিজের মতো করে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি লিখেছেন, "শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়েছে" (জীবনস্মৃতি)। ভাইপো ভাইঝিদের মধ্যে এঁরা দুজনেই সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'—Reminiscences, 'ছিন্নপত্র'—Glimpses of Bengal মূলের মতোই সুখপাঠ্য। তাঁর আর একটি বিখ্যাত অনুবাদ—The Realisation In Action—কর্মযোগ-শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ প্রবন্ধের ভাষান্তর। এই সকল ভাষান্তরিত রচনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মর্ডার্ন রিভিয়্যু'তে প্রকাশিত হত।

১৯৪০-এর ৩ মে সুরেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। এই সংবাদে স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরাকে একটি পত্রে লেখেন—"তোরা বোধহয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি বেশী ভালোবেসেছিলুম। নানা উপলক্ষে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছে করেছি বার বার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধহয় কাছে আসব, সেই দিন নিকটে এসেছে।"

'বিসর্জন' নাটকটি ১২৯৭ সালে গ্রন্থকাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি লেখাব বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথেব একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। "তিনি নিজের হাতে একখানা খাতা বাঁধিয়া আনিয়া 'ববিকা'র হাতে দিয়া নাটক লিখিবার বায়না ধরিলেন।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড)। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারি কাজে গেলেন শাজাদপুরে, সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের দেওয়া খাতাটি। মাস দুয়েকের মধ্যে রচিত হল অমর কাব্যনাট্য 'বিসর্জন'। উৎসর্গ কবিতার প্রথম স্তবকে সুরেন্দ্রনাথের এই ভূমিকার কথা কবি লিখেছেন—

"তোরি হাতে বাঁধাখাতা, তারি শখানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ক কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।"

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয়ও এই স্তবকে পাওয়া যায়। দীর্ঘ উৎসর্গের কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি রচনার পটভূমিকা ও পরিবেশের খুঁটিনাটি সহ বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

'বিসর্জন' নাটকের সুদীর্ঘ উৎসর্গ কবিতায় একটি অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবি 'বিসর্জন' কাব্যনাটকটি যখন লেখেন সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সতেরো। 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গের কবিতার স্তবক সংখ্যাও সতেরো। এই অভিনবত্ব সম্ভবতঃ বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। 'বিসর্জন' নাটকের দীর্ঘ উৎসর্গ পত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ

উৎসর্গ

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্— একা আমি, গৃহকোণ,
কাগজ-পত্তব ছড়াছড়ি।
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা একপাশে দেয় থানা,
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি 'পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ, অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি 'পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা— সারাদিন করে খেলা
উভচর মানবশাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক্ ঝক্।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ-মাঝে—

বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া।
পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশথেরা,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা—
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর।

পূর্বপ্রান্তে বনশিরে সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন।
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যুষে মধুমাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
সেই ভোরবেলা আমি মানসকুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন—
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্যধন।
আদিকবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,

ওই মায়াচিত্রবৎ তরুলতা ছায়াপথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁষে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক, বর্তমান-আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
'আজ' 'কাল' দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি পড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,
কেবলই নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস
উন্মাদনা চাহি দিনরাত—
সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্নে পড়ে তরুচ্ছায়া—
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়—
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে,
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর-সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের 'পরে।
আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি—
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে।
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।
তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহবেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব 'এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।'

সেই ছবি মনে আসে— টেবিলের চারি পাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই-তিন, ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা।
খাতা হাতে সুর করে অবাধে যেতেছি প'ড়ে,
কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—
তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল
শুনিয়া কাহিনী করুণার।

তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এইমত,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি'।

শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'ত আরো ভালো হলে'।
কেহ বলে, 'আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা ব'লে।'
কেহ বলে, এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'ত যদি অন্য কোনোরূপ।'
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়.
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি,
ও-সকল আনিস নে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তার লাগে। --রবিকাকা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, মনস্বিতা প্রভৃতির দুর্নিবার আকর্ষণে যে ক'জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক কবির সান্নিধ্য ও সহৃদয়তা লাভ করেছিলন তাঁদের মধ্যে লোকেন্দ্রনাথ পালিত অন্যতম।

লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিলাতে। বয়সে চার বছরের ছোট এই বন্ধুটির সহিত কবির সৌহার্দ্য লোকেন্দ্রনাথের লোকান্তর কাল (১৯১৬) পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।—"বিলাতে যখন আমি লণ্ডন য়ুনিভারসিটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারকের ছোট।...সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশী যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন।...কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে বাধা আমার মধ্যে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ বুদ্ধি শক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোট বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।"

লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু তারকনাথ পালিতের পুত্র। লোকেন্দ্রনাথ আই. সি. এস ও ব্যারিস্টারি উভয় পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ১৮৮৬-তে দেশে ফেরেন। চাকরি সূত্রে বিভিন্ন শহরে থাকতে হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সর্বদাই যোগাযোগ থাকত। এই যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম মাধ্যম ছিল 'সাধনা' পত্রিকা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। লোকেন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ, বহু কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লোকেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। লোকেন্দ্রনাথ লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল কামনা' ও 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতা দুটির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং মডার্ন রিভিয়্যু তে সেগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩) পর লন্ডন থেকেই বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন লোকেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয় ১৮৯১এ এবং 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' (২য় খণ্ড) প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ এ। এই গ্রন্থ দুটিই রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন বন্ধু লোকেন পালিতকে।

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে।

এই কাব্য গ্রন্থটি কবি বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত কে 'সুহৃত্তম' অভিধায় অভিহিত করে পরিহাস-কৌতুক রসে-ভরা একটি কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন। লোকেন্দ্রনাথ তখন যশোহরের জেলা জজ। এই উৎসর্গের কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বন্ধুর কাব্যরস উপলব্ধির উপর অগাধ আস্থা।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃত্তমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
  ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
  ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়
আশা করি নিদেন-পক্ষে
  ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে
  সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
  স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
কতকটা কী অগ্নিকণায়
  ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
  আপনি খসে পড়বে ধূলোয়,
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
  বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যগ্রন্থদ্বয় 'কথা' (১৯০১) এবং 'খেয়া' (১৯০৬) বিজ্ঞানীবন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেছেন। 'কথা' ১৩০৬ সালে মাঘ মাসে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। সত্যসন্ধানী কবি সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীকে 'কথা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখলেন ঃ—

উৎসর্গ

সুহৃদবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য
করকমলেষু

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তাব
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জগদীশচন্দ্র বসু এই দুই প্রতিভাধর ব্যক্তির পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক কবিতাটি প্রথম সাক্ষাতের পব কবি রচনা করেন।

১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন জগদীশচন্দ্র। সেই সময়ের ইংরেজ অধ্যক্ষ ও ইংরেজ শিক্ষা পরিচালকগণ দেশীয় অধ্যাপকদের বিলেতে গবেষণার কাজের সুযোগ দিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। চরম অপমান ও উপেক্ষার মধ্যেও জগদীশচন্দ্রকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে বিলেতে গবেষণার সুযোগ করে নিতে হয়। জীবনের এই সংগ্রামের সময় জগদীশচন্দ্রের প্রধানতম সহায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জগদীশচন্দ্রের তৃতীয়বার বিলেত প্রবাসকালে (জুলাই ১৯০০—অক্টোবর ১৯০২) রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে একটি পত্রে লেখেন, "তুমি কি আমাদের মতো লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ?...নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য তোমাকে তোমার কর্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক।...তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে।...বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে—তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়—আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভারতবর্ষের নহে।"

বাংলা গভর্নমেন্ট জগদীশচন্দ্রকে ছুটি মঞ্জুর না করায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—গবর্মেন্টি যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয় তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি।" রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর জগদীশচন্দ্রকে অর্থসাহায্য করেছিলেন।

কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের সম্বর্ধনা

সভায় সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র বসু নামাঙ্কিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্র—এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে। 'একজন বিজ্ঞানী, অন্যজন কবি—এঁদেব মধ্যে যে আকর্ষণ ছিল সে কেবল বন্ধুত্ব বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল।.. দুজনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চললেও তাঁরা যেন যথেষ্ট খোরাক পেতেন পরস্পরের কথাবার্তা আলোচনা থেকে।"

জগদীশচন্দ্র তাঁব "Nervous Mechanism in Plants" (১৯২৬) গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে। উৎসর্গপত্রে লেখেন ঃ—

"To

My Lifelong Friend Rabindranath Tagore"

Jagadish Chandra Basu

জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে একখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লিখেছিলেন, "সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।"

'কথা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করার পাঁচ বহর পর 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে। 'খেয়া'র উৎসর্গপত্রটি দীর্ঘ কবিতায় রচিত। 'খেয়া'র উৎসর্গ কবিবতাটির প্রথম ছত্র "বন্ধু এ যে আমার লজ্জাবতী লতা"। জগদীশচন্দ্র এই সময় লজ্জাবতী লতার স্পর্শ চেতনা নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। লজ্জাবতীর স্বাভাবিক স্পর্শকাতর নীরবতার সঙ্গে কবি তাঁর নিজের জীবনের আধ্যাত্মিক অবচেতনার তুলনা করে বললেন, 'আনো তোমার তড়িৎপরশ, হরষ দিয়ে যাও"। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের সম্পূর্ণ উৎসর্গপত্রটি এখানে উপস্থিত করা হল।

উৎসর্গ

বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

করকমলেষু

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।

কী পেয়েছে আকাশ হতে

কী এসেছে বায়ুর স্রোতে

পাতর ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপিচুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ-পরশ
হরষ দিয়ে দাও,
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্মপানে চাও।
সারা দিনের গন্ধগীতি
সারা দিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এ যে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা—
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,

সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই-যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবনমৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

কলিকাতা
১৮ আষাঢ় ১৩১৩

পাঁচ সন্তানের জনক রবীন্দ্রনাথ। তিন কন্যা—মাধুরীলতা বা বেলা, রেণুকা, মীরা এবং দুই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। রথীন্দ্রনাথ এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য পাঠান। পুত্রকে স্বদেশের সেবায় দীক্ষিত করাই ছিল কবির একমাত্র উদ্দেশ্য। কবির বিশ্বাস ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালন না করতে পারলে ভারতবর্ষের দুর্দশা ঘুচবে না। তিনবছর পর দেশে ফিরে রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, পতিসর, কালীগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদ শেখালেন, মাটির গুণাগুণ বিচারের জন্য ছোট পরীক্ষাগার তৈরী করলেন, মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য কৃষিব্যাঙ্ক গঠন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন। রূপবতী, গুণবতী বিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে (২৮ জানুয়ারী ১৯১০)। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পুত্রের বিবাহের মাধ্যমে বিধবাবিবাহ প্রচলন করেন। সে সময়ে নিঃসন্দেহে এটি একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা। বিবাহের পর প্রতিমা দেবীকে কবি মা-মণি বা বৌমা বলে সম্বোধন করতেন এবং প্রতিমাদেবী কবিকে বাবামশায় বলে সম্বোধন করতেন। পুত্রবধূর উপর অগাধ স্নেহে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কবি। প্রতিমা দেবীও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে সেবা করেছেন, কবির দেখাশোনা করেছেন, অতিথি অভ্যাগতদের যত্ন করেছেন। এছাড়া কবির আশ্রমের কাজ করা, দেখাশেনা করা প্রতিমাদেবী প্রতিদিনের অবশ্য কর্ম বলে মনে করতেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিই ছিলেন প্রতিমাদেবীর উৎসাহদাতা। প্রতিমা দেবীর লেখা 'নির্বাণ' গ্রন্থটিতে কবির শেষ জীবনের একটি ছবি পাওয়া যায়। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে ভ্রমণ করার সময় অনেকবারই রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী কবির সঙ্গী হয়েছিলেন।

বিপত্নীক কবির সকল চিন্তাভাবনাই পুত্র-পুত্রবধূকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। কোনো কোনো সময় মনে করতেন, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার জালে ওঁদের জড়িয়ে ফেলছেন। রথীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে কবি লেখেন—"তোদের দিনরাত্রি এমন করে আঁকড়ে ধরে আছি যা অন্যায় এবং হাস্যকর।" আরেকটি পত্রে কবি লেখেন—"আমি চিরদিন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলতে দেবার পক্ষপাতী কিন্তু আজকাল কেবলই আমি তোদের উপর জবরদস্তি করে নিজের ideal impose করবার জন্য এমন একটা প্রচণ্ড ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছি যে সে ভারি অদ্ভুত।" কিছুদিনের মধ্যে কবির এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন ঘটে এবং পুত্র-পুত্রবধূর সকল চিন্তা ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। "তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই"—'আশীর্বাদ শীর্ষক' একটি সনেট রচনা করেন কবি পুত্র ও পুত্রবধূর উদ্দেশে। পরে এই সনেটটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে "গীতালি" গীতিকাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতা হিসাবে সংযোজিত হয়। 'গীতালি' কাব্যগ্রন্থটি কবি যুগ্মভাবে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের কবিতাটি 'আশীর্বাদ' শিরোনামে প্রকাশিত। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও 'গীতালি' পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে উৎসর্গীকৃত এ বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। 'গীতালি' ১৩২১ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। 'গীতালি'র উৎসর্গের কবিতাটি লেখার তারিখ ১৬ আশ্বিন, ১৩২১।

আশীর্বাদ

এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি ব'লে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।

আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।
আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই ,
তোমার তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩২১
রাত্রি

'গীতালি' উৎসর্গের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গোরা' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন পুত্র রথীন্দ্রনাথকে।

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কল্যাণীয়েষু

১৪ মাঘ, ১৩১৬

লক্ষণীয় ১৪ মাঘ, ১৩১৬ রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমাদেবীর বিবাহের দিন।

কবির মৃত্যুর বছর চারেক আগে অগাধ স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ 'বাবামশায়' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন 'বৌমাকে'—প্রতিমাদেবীকে। নামহীনভাবে, শুধুমাত্র সম্পর্কের সম্বোধনের মাধ্যমে গ্রন্থ উৎসর্গীকরণের আর একটি উদাহরণ।

যে সকল 'বিদেশী সখা' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের আকর্ষণে শান্তিনিকেতন আশ্রমে অকৃত্রিম অনুরাগে ত্যাগের অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন তঁদের মধ্যে উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়রসন অন্যতম। উইলি পিয়রসন নামে ইনি পরিচিত। ১৯০৭ সালে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কলকাতার লন্ডন মিশনারী স্কুলে যোগদান পিয়রসনের কলকাতায় আসার সূত্রপাত ঘটায়। তখন তিনি আশাবাদী বিপ্লবী। কলকাতায় থাকাকালীন মাৎসিনির 'The Duties of Man' গ্রন্থটি ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন পিয়রসন। খ্রিস্টান অখ্রিস্টান ভেদাভেদ না করে এ দেশের মানুষের সঙ্গে পিয়রসনের অন্তরঙ্গতা সাহেব কর্তৃপক্ষ সুনজরে

দেখেননি এবং শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে মিশনের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন ইংল্যাণ্ডে

১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ডে অবস্থানের সময় পিযরসনের উদ্যোগে পিয়রসনের বাড়িতে আয়োজিত একটি সাহিত্যবাসবে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে প্রবন্ধ পড়লেন এক নবীন বাঙালি কবি তাঁর নাম সুকুমার রায় (তাতাবাবু)। এই সাহিত্যবাসরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এখানেই রবি ঠাকুরের সঙ্গে পিয়রসনের প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকতনের কাজে জীবন উৎসর্গ করার বাসনা প্রকাশ করলেন পিয়রসন। সোৎসাহে ও সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানালেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯১২ সালের শেষের দিকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এলেন পিয়রসন। রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্ররা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিদেশী রবীন্দ্রভক্তকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। পিয়রসনের শান্তিনিকেতন প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি লেখা আছে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে। পিয়রসন লিখেছেন—'আমি এই বিদ্যালয়ে সাধারণ দর্শনার্থী হিসাবে আসিনি, আমি যেন কোন সাধকের পুণ্যভূমিতে তীর্থযাত্রায় এসেছি।"

সময়টা ১৯১৩ সাল. দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের চলছিল নির্মম অত্যাচার। এরই প্রতিবাদে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আফ্রিকা যাওয়া স্থির করলেন দুই বন্ধু—এন্ডরুজ (চার্লস ফ্রিয়র এন্ডরুজ) ও পিয়রসন। যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণের জন্য তাঁরা এলেন শান্তিনিকেতনে। এই দুই বন্ধুর দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই গান্ধিজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে পিয়রসন ও এন্ডরুজ দুজনেই ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে কয়েকদিন আগে পরে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। প্রথম জীবনে কলকাতায় থাকাকালীন বাংলাভাষার সঙ্গে পিয়রসনের কিছুটা পরিচয় হয়েছিল, তাই শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়ে তা আয়ত্ব করতে তাঁর বিলম্ব ঘটেনি। শান্তিনিকেতনে অল্প সময়েই হয়ে উঠেছেন ঘরের মানুষ, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন ছাত্র, অধ্যাপকদের। শিশুদের প্রতিও তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম। পিয়রসন বলতেন—আমি বোধহয় আগের জন্মে বাঙালি ছিলাম।

১৯১৬ সালের তেসরা মে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকায় যাত্রা করেন। সঙ্গী হলেন এন্ডরুজ, পিয়রসন ও মুকুল দে পিয়রসন হলেন কবির সেক্রেটারি বা সচিব। যাত্রাপথে তাঁরা রেঙ্গুন পৌছান ৭ মে--রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে সেদিনই 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি একটি কবিতায় পিয়রসনকে উৎসর্গ করলেন "স্নেহাসক্ত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" বলাকা ১৯১৬ সালের মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ কবিতাটির মধ্য দিয়ে কত সহজে ও সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরাগী বিদেশী সাধকের চরিত্রটি চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। ভক্তের প্রতি কবির অকৃত্রিম অনুরাগ কবিতাটির প্রতি ছত্রে প্রকাশিত।

'বলাকা কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতা ঃ--

উৎসর্গ

উইলি পিয়রসন্ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর
৭ মে ১৯১৬

স্নেহাসক্ত
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র রচনার অনুবাদক হিসাবেও পিয়রসনের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের অনুবাদ করেন তিনি এবং মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশও মুগ্ধ করেছিল পিয়রসনকে। উত্তরায়ণের কোনার্ক বাড়িতে পিয়রসন রোপন করেছিলেন বিদেশী ফুলের লতা—রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন—'নীলমণিলতা'। এছাড়া কয়েকজোড়া সবুজ রঙের বিদেশী পাখিও পিয়রসন ছেড়ে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। কবি তারই বর্ণনা করে লিখেছেন—"এনেছ কবে বিদেশীসখা/বিদেশী পাখি আমার বনে/সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাঝে/উঠিছে ডাকি সহজ মনে।" (পরদেশী)

পিয়রসনের লোকান্তরের পর শান্তিনিকেতন হাসপাতালটি উৎসর্গ করা হয় তাঁরই নামে—পিয়রসন মেমোরিয়াল হসপিটাল।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটি ১৩৩৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় কবি বলেছেন, "শুধায়োনা, কবে কোন গান/কাহারে করিয়াছিনু দান"। "তুমি কি শুনেছ মোব বাণী,/হৃদয়ে নিয়েছ তারি টানি?" কবি কার উদ্দেশে এ সকল কথা বলেছেন আমাদের জানা নেই। কারণ 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কবি যাঁকে কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তার নাম উল্লেখ করেননি। এরকম অনুল্লেখ উৎসর্গ-পত্র রবীন্দ্র রচনায় আরও লক্ষ্য করা যায়। মহুয়ার উৎসর্গপত্রটি একটু ব্যতিক্রমী। কাব্যগ্রন্থখানি কবি এমন একজনকে উৎসর্গ করেছেন যাঁর নাম কবির জানা নেই। তাই উৎসর্গের কবিতায় কবি লিখেছেন—

"জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।"

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানি না তোমার নাম
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থখানি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় "কবি সত্তর বছর পার হয়ে ভাবছেন তাঁর জীবন কাব্যসৃষ্টির অন্তে উপনীত হয়েছে। তাই এই কাব্যখণ্ডের নাম দেন পরিশেষ।" কবি তাঁর দশ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ সংগীতপাগল সাহিত্যসেবী অতুলপ্রসাদ সেনকে কবিতার মাধ্যমে পরিশেষ কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। বয়ঃকনিষ্ঠ অতুলপ্রসাদকে কবি যে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন 'পরিশেষ' কাব্যের উৎসর্গের কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

অতুলপ্রসাদ বাংলা সংগীত জগতের অন্যতম গীতরচয়িতা ও সুরকার। তাঁর রচিত সংগীতে ভক্তিরস, প্রেমরস ও স্বদেশপ্রীতির ত্রিবেণী সংগম লক্ষ্য করা যায়। সংগীতের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় এবং ক্রমে এই পরিচয়ই ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়।

পেশায় ব্যবহারজীবী অতুলপ্রসাদের স্থায়ী বসবাস ও কর্মক্ষেত্র ছিল লখনউ। কবি উত্তরভারত ভ্রমণের সময় অতুলপ্রসাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতেন। অতুলপ্রসাদও কলকাতায় এলে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা অতুলপ্রসাদের সাহিত্য সেবার অন্যতম নিদর্শন। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র রূপে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। অতুলপ্রসাদ পত্রিকাটির নামকরণ করেন 'উত্তরা'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, পত্র 'উত্তরা' পত্রিকাকে অলংকৃত করেছিল। 'উত্তরা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসে। কবির 'আশীর্বাদ' শীর্ষক কবিতাটি উত্তরা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। এই 'আশীর্বাদ' কবিতাটিকে সামান্য পরিবর্তন করে রচিত হয়েছে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতা। উৎসর্গের কবিতাটিতে কোনো তারিখের উল্লেখ নেই।

১৩৪১ এর ৯ই ভাদ্র লোকান্তরিত হন অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদের মৃত্যুতে গভীর বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ বিদেহী বন্ধুর উদ্দেশে রচনা করলেন 'অতুলপ্রসাদ সেন' শীর্ষক কবিতাটি। কবিতাটি উত্তরার ঐ বছরের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'অতুলপ্রসাদ সেন' শীর্ষক কবিতাটি 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের সংযোজন অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন
করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে।
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে,
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নন্দলাল বসুর প্রথম পরিচয় হয়। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ, লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বছরে তিনি অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষান্তে তিনি অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের শিল্প শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগ্রন্থ 'চয়নিকা'য় নন্দলাল বসু কবির ইচ্ছানুযায়ী ছয়টি ছবি অঙ্কন করেন। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় এই কাজ সম্পন্ন হয় এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত এভাবেই ঘটে।

নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন ১৯১৪ সালে। তখনও শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। নন্দলালের শান্তিনিকেতনে প্রথম আগমনে কবি একটি কবিতার দ্বারা তাঁকে সংবর্ধিত করলেন।

তোমার তূলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী চিত্ত
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।

"এই শুভদিনে নন্দলাল জানিতেনও না যে, এই শান্তিনিকেতন তাঁহার শিল্পীজীবনের কেন্দ্র হইবে। রবীন্দ্রনাথও জানিতেন না যে, বিশ্বভারতীর প্রধান একটি অঙ্গ নন্দলাল গড়িয়া তুলিবেন।" [রবীন্দ্র জীবনী (২য়)]।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জাপানি চিত্রকর আরাইসান এলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলাল আরাইসানের কাছে দূর প্রাচ্যের তুলির কাজ আয়ত্ত করেছিলেন।

১৯১৫ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্রা'র চিত্রশালার সঙ্গে যুক্ত হন। কবির পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে ছবি আঁকা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নন্দলাল। ১৯১৯ সালে পূজার ছুটির পরে নন্দলাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সুরেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও নন্দলাল এই ত্রয়ীর যোগে কলাভবনের পত্তন হইল." রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।" কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হল এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হলেন স্বয়ং নন্দলাল। সে সময় থেকেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে সকলের 'মাস্টার মশাই' হলেন নন্দলাল। রবীন্দ্র পরিকর গ্রন্থে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"কবি তাঁর কল্পনালোকে তাঁর আশ্রমের যে ছবিটি দেখেছিলেন, নন্দলালের প্রভাবে এবারে তা বাস্তবরূপ লাভ করল।" বিশ্বভারতীর পুরানো গ্রন্থগারের দেওয়ালে, চীনভবনের বারান্দায়, হিন্দীভবনের হলে, শ্রী নিকেতনের উৎসবমঞ্চে ও দিনান্তিকার দেওয়ালে রয়েছে নন্দলাল বসুর শিল্প প্রতিভার সাক্ষ্য। শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে কোন অনুষ্ঠানে সৌন্দর্যের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন নন্দলাল তাঁর আল্পনার কারিগরিতে, সহজপ্রাপ্য ফুল ও উপকরণের মাধ্যমে।

নন্দলালের অঙ্কিত ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ 'শুকসারী', 'দেবদারু' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা লেখেন। নন্দলালের স্কেচ দেখে কবি ছড়ার ছবি'র প্রায় সব কবিতাই রচনা করেন।

"কিশোর গুণী" নন্দলালের পঞ্চাশ বছর বয়সে কবি নিজেকে "সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা" এই বিশেষণে ভূষিত করে নন্দলালকে একটি কবিতায় আশীর্বাদ জানান। কবিতাটির শিরোনাম ছিল আশীর্বাদ।

'বিচিত্রিতা' কবিতা গ্রন্থটি ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নন্দলাল বসু সহ বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত একত্রিশখানি চিত্র অবলম্বন করে এই গ্রন্থের একত্রিশটি কবিতা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। মূল গ্রন্থে কবিতার সঙ্গে চিত্রগুলিও মুদ্রিত হয়। 'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থের শুরুতে নন্দলালের উদ্দেশে রচিত 'আশীর্বাদ' কবিতাটি সংযোজিত করে গ্রন্থটি কবি নন্দলাল বসুকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের কবিতার একটি পঙ্ক্তি অনুধাবনযোগ্য। "ছবির পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়।"—কথাটি সর্বাংশে সত্য। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সাহচর্য ব্যতীত নন্দলালের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হত না। আবার একথা সত্য যে শান্তিনিকেতনে নন্দলালের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল।

কবির লোকান্তর গমনের পর নন্দলাল প্রায় পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ও সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র সাধনায় সমর্পিত প্রাণ ছিলেন শিল্পী নন্দলাল।

বিচিত্রিতা কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

আশীর্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি
সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা,
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের-লীলালিখন-ভরা পরিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি,
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি।

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রঙ জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে।

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়।

চিরবালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে,
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা-'পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

শান্তিনিকেতন
রাসপূর্ণিমা
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

১৯৩৩ সালে কৃষ্ণ কৃপালনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে আসেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণ কৃপালনির অন্তর্নিহিত গুণের সমাদর করেছিলেন। কৃষ্ণ কৃপালনির সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালের মে মাসে কবির জন্মদিনে Visva Bharati Quarterly র নবপর্যায় পুনঃ প্রকাশ শুরু হয়। ১৯৪৬ এ কৃষ্ণ কৃপালনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিল্লি ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত Visva Bharati Quarterly সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কবি তাঁকে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে ইংরাজি ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। স্বল্পকালের জন্য পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করেছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি।

কবির 'চোখের বালি' উপন্যাসটি 'Binodini' নামে ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি। 'Rabindranath Tagore A Biography' নামে কবির একটি জীবনচরিত রচনা কৃপালনির একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

নন্দিতা কবির একমাত্র দৌহিত্রী (মীরা দেবীর কন্যা)। কৃপালনির শান্তিনিকেতনে অবস্থানের বছর তিনেকের মধ্যে কৃষ্ণ কৃপালনি ও নন্দিতা প্রগাঢ় অনুরাগে আবদ্ধ হন। ১২ বৈশাখ ১৩৪৩ এ শান্তিনিকেতনে পারিবারিক বিবাহরীতি অনুযায়ী উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

দৌহিত্রী নন্দিতা ও প্রিয়ভাজন কৃষ্ণ কৃপালনির শুভ পরিণয় উপলক্ষে 'আশীর্বাদ' শীর্ষক একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা রচনা করে কবি নবদম্পতিকে অর্পণ করেন। এই কবিতাটির মাধ্যমে কবি তাঁর 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থখানি কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালনি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতাকে যুগ্মভাবে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালনি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ

নবজীবনের ক্ষেত্রে দুজনে মিলিয়া একমনা
যে নব সংসার তব প্রেমমন্ত্রে করিছ রচনা
দুঃখ সেথা দিক বীর্য, সুখ দিক সৌন্দর্যের সুধা,
মৈত্রীর আসনে সেথা নিক স্থান প্রসন্ন বসুধা,
হৃদয়ের তারে তারে অসংশয় বিশ্বাসের বীণা
নিয়ত সত্যের সুরে মধুময় করুক আঙিনা।
সমুদার আমন্ত্রণে মুক্তদ্বার গৃহের ভিতরে
চিত্ত তব নিখিলেরে নিত্য যেন আতিথ্য বিতরে
প্রত্যহের আলিম্পনে দ্বারপথে থাকে যেন লেখা
সুকল্যাণী দেবতার অদৃশ্য চরণচিহ্নরেখা।
শুচি যাহা, পুণ্য যাহা, সুন্দর যা, যাহা-কিছু শ্রেয়,
নিরলস সমাদরে পায় যেন তাহাদের দেয়।
তোমার সংসার ঘেরি, নন্দিতা, নন্দিত তব মন
সরল মাধুর্যরসে নিজেরে করুক সমর্পণ।
তোমাদের আকাশেতে নির্মল আলোর শঙ্খনাদ,
তার সাথে মিলে থাক দাদামশায়ের আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২ বৈশাখ ১৩৪৩

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও সিটি কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রর কন্যা নির্মলকুমারী মহলানবীশ, ডাকনাম রানী। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রানী নামে ডাকতেন এবং চিঠিপত্রে ঐ নামেই সম্ভাষণ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের আর এক ব্যক্তিত্ব প্রবোধচন্দ্র মহলানবীশের পুত্র প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ। ব্রাহ্মসমাজের সূত্রেই রানী ও প্রশান্তচন্দ্রের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত, প্রণয় ও পরিণতিতে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

প্রশান্তচন্দ্রের মাতুল বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মমতে নির্মলকুমারী ও প্রশান্তচন্দ্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

রানীর প্রথম পরিচয় হয়। প্রশান্তচন্দ্র পূর্ব থেকেই কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

১৯২৬ সালে কবির ইউরোপ ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী। কবির বিভিন্ন ভ্রমণে সঙ্গী হতেন এই মহলানবীশ দম্পতি। নির্মলকুমারী স্বইচ্ছায় এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে ভ্রমণকালীন সময়ে কবির দেখাশোনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

১৯২৮ এর মে মাসে কবির বিলাত ভ্রমণেও সঙ্গী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী। যদিও কবির অসুস্থতার কারণে বিলাত যাত্রা সেবার সম্পূর্ণ হয়নি।

১৯৩১—১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী বরানগরে পুষ্পোদ্যান সমন্বিত একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। বাড়িটির নাম 'শশী ভিলা'। এই বাড়িতেই কবির 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ একটি কবিতায় উৎসর্গ করেন 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ'কে। এই দীর্ঘ উৎসর্গ কবিতাটিতে মহলানবীশ দম্পতির উদ্যানপ্রেমিকতা এবং কবির 'শশীভিলা' বাড়িতে কিছুদিনের বাসের স্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

কবির শেষ জীবনে অন্যান্যদের সঙ্গে রানী মহলানবীশ ছিলেন কবির অন্যতমা সেবিকা। রানী মহলানবীশের লেখা 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থটিতে কবির শেষ জীবনের কথা জানা যায়।

রানী মহলানবীশকে কবি যেমন অগাধ স্নেহ করতেন, রানী মহলানবীশেরও ছিল কবির প্রতি অচল ভক্তি। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গের মাধ্যমে এই ভক্তিরই স্বীকৃতি কবি দিয়েছেন।

উৎসর্গের কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ

ইটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ-আঙিনায়।
শরৎ-লক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারি গাছের শ্রেণী।

দক্ষিণ ধারে পুকুরের ঘাট বাঁকা সে কোমর-ভাঙা,
লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।
জামরুল গাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।
লতানে যুথীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘুরা-ফিরা।
পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খসে খসে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে।
একসার মোটা পায়াভারী পাম উদ্ধত মাথা-তোলা,
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলিতি পাহারা-ওলা।

বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে
বেড়ার ওপারে মৈসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি—'নেত্রকোণা'

ওরাওঁ জাতের মালী ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে-
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
মাটি গড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ীর টানে
গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।

রাত পোহালেই পাড়ার গোয়ালা গাভীদুটি নিয়ে আসে,
অধীর বাছুর ছুটোছুটি করে পাশে
সাড়ে ছ'টা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের 'পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতলা বাড়ি,
আলসের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি।
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে,
সবুজ গহনে দু-চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব-প্রণতি-ভরা
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।
শুনেছি এবার হেথায় তোমার কদিনের ঘরবাড়ি
চলে যাবে তুমি ছাড়ি।
মেঘরৌদ্রের খেলার সৃষ্টি ওই পুকুরের ধারে
লজ্জিত হবে অকবি ধনীর দৃষ্টির অধিকারে।
কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে—
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম—
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে, মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন
মিলিবে মেঘের সাথে।

শান্তিনিকেতন
১ ভাদ্র ১৩৪৩

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্নেহধন্য কর্মসূত্রে বৈজ্ঞানিক ও রসায়নবিদ-রাজশেখর বসু ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যাল'এর

একজন কর্মকর্তা বা পরিচালক। রাজশেখর বসু বিয়াল্লিশ বছর বয়সে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। ১৯২২ সালে ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় দুটি সরস ব্যঙ্গাত্মক গল্পগ্রন্থ—'বিরিঞ্চিবাবা' এবং 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। ১৯২৪ সালে পরশুরাম ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ব্যঙ্গ ও পরিহাস মিশ্রিত গল্পসংগ্রহ, 'গড্ডলিকা'। এই গ্রন্থটিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় লেখেন—"ভয় ছিল পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে, কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল।...লেখাটার উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকা হাত।" 'গড্ডলিকা' গ্রন্থসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ও রাজশেখরের পরিচয়। এর পরবর্তী সময়ে রাজশেখর বসু প্রায়ই শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ও রাজশেখরের মধ্যে একটা প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবি তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের প্রুফ দেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজশেখর বসুকে। গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে কবির স্বকৃতজ্ঞ উল্লেখ আছে। বিশ্বভারতীর বিজ্ঞান বিভাগ ও কলেজ ল্যাবরেটরির নামকরণ করা হয় 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন'।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারেই রাজশেখর বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলা বানান সংস্কার সমিতির সভাপতি মনোনীত হন। এ প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু কৃত বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিধান 'চলন্তিকা'র উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুক রসে সমৃদ্ধ ছড়া জাতীয় কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থ 'খাপছাড়া' উৎসর্গ করেন 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বন্ধুবরেষু' কে। 'খাপছাড়া' ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বহু রঙিন ছবিতে ও রেখাচিত্রে কবি নিজেই চিত্রিত করেছিলেন। উৎসর্গের কবিতাটির রচনাকাল ৩ ভাদ্র, ১৩৪৩।

উৎসর্গের কবিতাটি ছাড়া 'খাপছাড়া' গ্রন্থটির ভূমিকাতেও কবি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। এটিও সরস কবিতা। ভূমিকার কবিতাটির রচনাকাল ১৬ পৌষ, ১৩৪৩। 'খাপছাড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"ঠিকানা নেই আগু পিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।"

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন,

"সে র উৎসর্গে যে কথাগুলো গভীর সুরে বলা হয়েছে তারই লঘু প্রতিধ্বনি 'খাপছাড়ার' উৎসর্গে। চতুরানন ব্রহ্মার তিনটি মুখে দর্শন, বেদ এবং কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতি, কিন্তু চতুর্থ মুখে?

নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।

প্রথম বইটিতে ব্রহ্মার খেয়ালের স্বপ্ন, দ্বিতীয়টিতে তার পাগলামির অট্টহাসি। কিন্তু দুই-ই এক।"

"রাজশেখরকে কবি যে খাপছাড়া উৎসর্গ করিলেন তাহা অর্থপূর্ণ ; কারণ রাজশেখর গল্প সাহিত্যে এই খাপছাড়াই প্রবর্তক।" (রবীন্দ্র জীবনী ৪)

১৩৪৩এ 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৩৩৯এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষুদ্র উপন্যাস 'দুই বোন'। এই গ্রন্থটিও কবি 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু করকমলে' উৎসর্গ করেন।

'খাপছাড়া' গ্রন্থের উৎসর্গের সরস কবিতাটি এবং গ্রন্থটির ভূমিকা উদ্দেশে লিখিত কবির আরেকটি সরস কবিতা—দুটিই উদ্ধৃত করা হল ঃ—

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
বন্ধুবরেষু

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখ কথা তার
কোন মানে-মোদ্দার

হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্‌কার—
শুধাব, বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ-উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা।
রসে হয় দ্রবিতা,
কজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে
দেখাব সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

[শান্তিনিকেতন] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ ভাদ্র ১৩৪৩

ভূমিকা

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোর আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,

গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চারদিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে, শেষে
একটুখানি মুচকে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা যেই
দেখা দিল ধুলোর মাঝেই
দুটো বেগুন, একটা চড়ুই-ছানা,
জামের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটিমাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুনুচি একখানা,
টুকরো বাসন চিনেমাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়কেকাঠির,
নলছে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠটা—
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ ১৩৪৩

কবি জীবনের পড়ন্ত বেলায় নাতনী নন্দিনীকে (রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমাদেবীর পালিত কন্যা, ডাকনাম পুপু, পুপে) গল্প শোনাতেন। এই গল্পগুলি এবং আরও কিছু গল্প একত্রিত করে তৈরী হয় গল্পগ্রন্থ 'সে' (১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথ 'সে' গল্পগ্রন্থখানি একটি কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সুবিখ্যাত নট ও নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের দৌহিত্র বংশে ১৮৮৩ সালের ২৬ শে জুন হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন. পদার্থবিদ্যায় এম. এ (তখন এম. এস. সি ডিগ্রী ছিল না) পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথমে ডেমনস্ট্রেটর হন। পরে ঐ কলেজেই অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি বাঙলা ও বাঙালির কাছে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করার জন্য বাঙলাভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর রচিত 'নব্যবিজ্ঞান', 'বাঙালীর খাদ্য', 'বিশ্বের উপাদান', 'তড়িতের অভ্যুত্থান', 'ব্যাধির পরাজয়', 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাঙলায় বিজ্ঞানচেতনা প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

বিশ্বভারতীর সূচনাকাল থেকে চারুচন্দ্রের বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন ১৯৩২ সালে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষতা এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্র রচনাবলী সম্পাদনা ও বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহমালা প্রকাশ তাঁর জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল কীর্তি। চারুচন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞজন রচিত মোট ১২৫ খানি প্রমাণিক পুস্তিকা 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালা' পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। নিপুণ দক্ষতায় কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন চারুচন্দ্র। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। তিনি কবিকে দিয়ে তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়ে নেন। কবির চিঠিপত্র সংকলন, হারিয়ে যাওয়া স্বরলিপি উদ্ধার প্রভৃতি কর্মে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। পরবর্তী কোন এক সময়ে তিনি গ্রন্থনবিভাগ ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চারুচন্দ্রের উপর কবির নির্ভরতা এতটাই ছিল যে কবি এই সংবাদে বিচলিত হয়ে চারুচন্দ্রকে এক পত্রে লেখেন—"আমার গ্রন্থ প্রকাশ তরণীর হাল ছেড়ে দিয়ে ওটাকে যদি ডুবতে দেন তাহলে সেটা ব্রাহ্মণোচিত হবে না। এ শাস্তি দুঃসহ হবে।"

'সে' গল্পগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতার এক অংশে কবির বিনয়াবনত ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে।

> "যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
> সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
> যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
> কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
> দিলেম উজাড় করে ঝুলি।
> লও যদি লও তুলি,
> রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
> কোন দায় নাই।"

'সে' গল্পগ্রন্থেব উৎসর্গের কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেবিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধাব,
সুদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি বাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,

রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৩

সুবিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার ১৮৮৮ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েকবছর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিও ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে নীলরতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সূত্রপাত। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ গঠন এবং এমনই বহু কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ আয়োজনে নীলরতন রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ করেন। উভয়ের মধ্যে আমৃত্যু সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল।

নীলরতন ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাইটহুড (স্যর) উপাধি প্রাপ্ত হন। নীলরতন বহুবার রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর কবি হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং প্রায় দু দিন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। কবির এই অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া মাত্রই নীলরতন সরকার কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন পৌঁছে কবির চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কবিকে সুস্থ করে তোলেন।

'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ এর আগস্ট মাসে অর্থাৎ কবির এই অসুস্থতার ঠিক এক বছর পরে। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটি কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতায় উৎসর্গ করলেন 'ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু' কে। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ঠিক আগের বছর দুরারোগ্য ব্যাধির স্মৃতি এবং তা থেকে মুক্তির কথা মনে করে উৎসর্গের কবিতায় কবি লিখলেন—"অন্ধতামস গহ্বর হতে/ফিরিনু সূর্যলোকে/বিস্মিত হয়ে আপনার পানে/হেরিনু নূতন চোখে।"

রবীন্দ্রনাথ ও নীলরতন দু জনেরই জন্ম ১৮৬১ সালে। রবীন্দ্রনাথ ৭মে এবং নীলরতন ১ অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দু বছর পর ১৯৪৩-এ নীলরতন সরকারের তিরোধান হয়।

সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতাটি এই ঃ

উৎসর্গ

ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার
বন্ধুবরেষু

অন্ধতামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।
মর্তের প্রাণরঙ্গভূমিতে
যে চেতনা সারারাতি
সুখদুঃখের নাট্যলীলায়
জ্বেলে রেখেছিল বাতি
সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নবপ্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপলোকের দ্বারে
আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি-
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি।

শান্তিনিকেতন
১ শ্রাবণ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গের বিষয়টি কেবলমাত্র পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর জীবনের চলার পথের অনেক ঘনিষ্ঠ অনাত্মীয়কেও উৎসর্গ করেছেন অনেক গ্রন্থ। অনাত্মীয়কে গ্রন্থ উৎসর্গের তালিকাটিও বেশ দীর্ঘ। এরকমই একজন অনাত্মীয়—'পথিক বন্ধু'—অন্ধকার 'রাত্রির তারা' হলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। একটি কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আরোগ্য' কাব্য গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'আশ্রম নির্মাণকার্যে' যথার্থ 'নিপুণ স্থপতি' সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়কে। 'আরোগ্য' ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী শিষ্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আকৈশোর। ১৯১৬ সালে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হন নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও মুকুল দে শিল্পীত্রয়। সে সময়ই সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছোটদের ছবি আঁকা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমশ নিজের বাঁধাধরা কাজের বাইরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সার্বিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নিজেকে আশ্রমের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশে ১৯১৯এ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গী করেন। ১৯২৪এ দক্ষিণ আমেরিকা সফর এবং ১৯৩৩এ সিংহল ভ্রমণেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হলেন সুরেন্দ্রনাথ। দেশ বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথের এই অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূর্ত হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতনের অনেক ঘরবাড়ি, ভবনের স্থাপত্যকলার মধ্যে। কবির মাটির বাড়ি 'শ্যমলী'র স্থাপত্য পরিকল্পনা ও রূপদান সুরেন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রসুহৃদ বৈদ্যকুলজাত শ্রীশ চন্দ্র মজুমদারের কন্যা রমার সঙ্গে কায়স্থ সুরেন্দ্রনাথ করের অসবর্ণ বিবাহের বাধা রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ হস্তক্ষেপেই দূরীভূত হয়েছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করে তাঁদের উপহার দেন। কবিতাটি 'পরিণয়' শিরোনামে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪০এ সেপ্টেম্বর মাসে কালিম্পঙে কবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে অসুস্থ কবি প্রায় একমাস চিকিৎসাধীন ছিলেন. একটু সুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন ফেরেন। কবির রোগশয্যায় যাঁরা পরম মমতায় ও গভীর শ্রদ্ধায় কবির আরোগ্যের জন্য সদাতৎপর ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর অন্যতম।

'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তরতম জন্মদিবসে

'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থটিও উৎসর্গ করেন সুরেন্দ্রনাথ করকে। উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ ঃ—

কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে
শান্তিনিকেতন,
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৮ আশীর্বাদ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শোভন সোম সম্পাদিত 'রবীন্দ্র পরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ কর সম্বন্ধে রবীন্দ্র সান্নিধ্যলাভে ধন্য রানী চন্দ বলেছেন—"এক বৃদ্ধ বন্ধু সুরেনদাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আপনি দিনে একবার করে গীতা পড়ুন। সুরেনদা হেসে ধীরভাবে বলেছিলেন—'আমি গুরদেবকে ছুঁয়েছি, তাঁর কবিতা পড়েছি, আমার অন্য কিছুর দরকার নেই'।' সুরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে যে কত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এই কথার মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় কবি কিছু বহুবচন ব্যবহার করেছেন—'যারা', 'তোমরা'। অর্থাৎ এই উৎসর্গের কবিতাটিতে কবি কল্যাণীয় সুরেন্দ্রনাথ কর' কে সম্ভাষণ করলেও কবি তাঁর অসুস্থতার সময়ে অন্যান্য সকল সেবক সেবিকাকেই স্মরণ করেছেন।

'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় কবি লিখেছেন—

কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা খেলার সাথি, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমারা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিকবন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
সকাল

দেখেছিনু যে দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।”

উপরের পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের ‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতার অংশবিশেষ। এখানে যে ‘দুটি নারী’র কথা কবি উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন অমিতা ঠাকুর ও নন্দিতা কৃপালনি। ‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থটি ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতাটি ‘নির্বাণ’ গ্রন্থ-রচয়িতা কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে নন্দিতা কৃপালনি ও অমিতা ঠাকুরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

অমিতা ঠাকুর শান্তিনিকেতন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর অমিতা ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র অজিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অমিতার বিবাহ হয়। অমিতা ঠাকুর হলেন ঠাকুর পরিবারের বধূ এবং রবীন্দ্রনাথের আদরের নাতবৌ। রবীন্দ্রনথের শেষশয্যায় যে সকল সেবক সেবিকা কবির সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন অমিতা ঠাকুর তাঁদের অন্যতম।

‘রোগশয্যায়’ কাব্যের উৎসর্গপত্র ঃ—

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে,
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১ ডিসেম্বর ১৯৪০। প্রাতে

রবীন্দ্রনাথ দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনিকে দুটি কাব্যগ্রন্থ যুগ্মভাবে উৎসর্গ করেছিলেন প্রথমটি 'পত্রপুট' (১৯৩৬)—কৃষ্ণ কৃপালনি ও নন্দিতা (গঙ্গোপাধ্যায়) কে। দ্বিতীয়টি 'রোগশয্যায়' (১৯৪০)—অমিতা ঠাকুর ও নন্দিতা কৃপালনিকে। ১৯৪১ এ 'গল্পসল্প' প্রকাশিত হলে গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করলেন এককভাবে 'নন্দিতাকে'।

নন্দিতার শিক্ষালাভ শান্তিনিকেতনে। কৃষ্ণ কৃপালনির সঙ্গে বিবাহের পরেও নন্দিতা-কৃষ্ণ কৃপালনির শান্তিনিকেতনেই বসবাস ছিল। কবির জীবিতকালে তাঁরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেননি। মৃত্যুর মাত্র ছ-মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পসল্প' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'নন্দিতাকে'। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ উৎসর্গীকরণের এটিই শেষ নিদর্শন।

কবির শেষ রোগশয্যায় সেবক-সেবিকাদের মধ্যে নন্দিতাও ছিলেন। গল্পসল্প গ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় কবি নন্দিতাকে তাই শেষ পারানির খেয়ার নেয়ে বলেছেন।

১৯৪১-এর ৭ আগস্ট কবির মহাপ্রয়াণ হয়। এরপর ১৯৪৬এ স্বামী সহ নন্দিতা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলেও নন্দিতা ও কৃষ্ণ কৃপালনির আমৃত্যু শান্তিনিকেতনেব সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

'গল্পসল্প' গ্রন্থের উৎসর্গের কবিতাটি ঃ—

নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
নূতন-জানা মেয়ে।
ফেরাবে মুখ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপখানি।

১২ মার্চ ১৯৪১

[কণিকা (১৮৯৯), শোকগাথা (১৯০৬) প্রীতি (১৯১০)]

ত্রিপুরার রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী সমকালীন মহিলা কবিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। পিতা বীরচন্দ্রের কবি প্রতিভা অনঙ্গমোহিনীর মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতেই রাজ অন্তঃপুরে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছিল এবং অনঙ্গমোহিনীও সেই আলোতে আলোকিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

অনঙ্গমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কণিকা ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি কবি তাঁর প্রয়াত পিতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

উপহার

এ নহে কবির গাথা কবিতা কুসুম মালা
সুবাসিত চির-মধুময়
এ কেবল শুষ্ক ফুল, বিহীন সুবাস মধু
মলিন বিলীন দলচয়।
তব পদ পূজাযোগ্য নহে এই শুষ্ক ফুল
তবু পিতা জানি আমি মনে,
নীরস কবিতা মম হইবে সরস অতি
শুধু তব স্নেহের নয়নে।
যদিও এ লোকে তব স্নেহের সে কণ্ঠস্বর
চিরতরে গিয়েছে থামিয়া।
নাহি সুধাইবে আর কি আমি এসেছি নিয়ে
দেখিবেনা বারেক চাহিয়া।
তবু পিত উৎসর্গিনু স্বর্গীয় চরণে তব,
অতি ক্ষুদ্র মম উপহার,
অশ্রুজল বিন্দু সহ ভকতি প্রণাম এই
লহ পিতা দীন তনয়ার।

কৈশোরে উজীর গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরের সহিত অনঙ্গমোহিনী দেবী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০৫ সালে তাঁব বৈধব্য ঘটে। ১৯০৬ সালে অনঙ্গমোহিনীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "শোকগাথা" প্রকাশিত হয়। কবির জীবনের চরম দুর্ভাগ্যে মনোজগতে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় 'শোকগাথা'য় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থের নিবেদনে কবি লিখেছেন "...শোকগাথা আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র। সুতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।"

অনঙ্গমোহিনীর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'প্রীতি' প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি।

'শোকগাথা' ও 'প্রীতি' দুটি কাব্যগ্রন্থই কবি তার প্রয়াত স্বামী উজীর গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।

শোকগাথা (কাব্যগ্রন্থ)

পরম পূজনীয়
স্বর্গীয় উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্ম
স্বামী-দেবতার চরণ উদ্দেশে প্রেম ও প্রীতির

॥ উপহার ॥

১

স্বামিন্,

গিয়েছ স্বরগ পুরে!
কোথা গো সে কত দূরে,
অজানা সে কোন্ দেশে করিতেছ বাস?
পশিতে কি পারে তথা,
বিষাদ-বিরহ-গাথা,
বেদনার অশ্রুজল দুখের নিশ্বাস?

২

পর পারে জীবনের,
গেছ চ'লে! দুজনের
মাঝে আজি অন্তরাল সৃজিয়া অপার ;
নিয়ে গেছ সুখ আশা,

প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
রাখিয়া গিয়েছ শুধু চির অশ্রুধার!

৩

হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,
বিষাদ বরষা ঝরে,
শোক-বায়ু হু হু ক'রে সদা করে খেলা ;
গণিতেছি গত দিন,
একাকিনী সাথিহীন,
জানি না ফুরাবে কবে জীবনের বেলা!

৪

মর্ম্মবিদ্ধ শোক-বাণে,
সে ক্ষত আহত প্রাণে,
উৎসরে রোদন রূপে এ গীতি আমার।
লহ নাথ একবার,
দীর্ণ হৃদি বেদনার,
অশ্রুজল বিন্দু মাখা প্রেম-উপহার!

আগরতলা—নূতন হাবেলী,}
উজীর বাড়ী। —অনঙ্গমোহিনী।

প্রীতি (কাব্যগ্রন্থ)

উৎসর্গ

তোমার কণ্ঠের সুরে বাঁধিয়া লইয়া বীনা
প্রতি তারে দিয়াছি ঝঙ্কার ;
গাহে না সে অন্য গান তব প্রিয় নাম বিণা,
গীতি, প্রীতি সকলি তোমার।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৭৭—১৯৫৫)

[ঝরাফুল (১৯১১), ধানদূর্বা (১৯২১),
শতনবী (১৯৩০), রবীন্দ্র আরতি (১৯৩৭)]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মধ্যে করুণানিধান সর্বজ্যেষ্ঠ। রবীন্দ্র-বলয়ে অবস্থান করলেও কাব্য রচনায় তাঁর স্বতন্ত্রতা পাঠককে মুগ্ধ করে।

করুণানিধানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাফুল' ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি 'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থটি "কালীপদ মুখোপাধ্যায় চিরযুক্তেষু" কে একটি কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন। 'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে উৎসর্গ পত্রে উৎসর্গ-কবিতা 'দেওঘরে' পাওয়া যায়। কিন্তু রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'ত্রয়ী' গ্রন্থটির 'ঝরাফুল' কাব্যে 'দেওঘরে' কবিতাটি উৎসর্গের কবিতা হিসাবে দেখানো হয়নি। কাব্যের প্রথম কবিতা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। কালীপদ মুখোপাধ্যায় একজন কাব্যরসিক ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। করুণানিধানের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়। অসুস্থ অবস্থায় কবি বেশ কিছুদিন দেওঘরে কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। এই সময় দেওঘরে দুই বন্ধুতে দেওঘরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করে কাব্য আলোচনা করে দিন অতিবাহিত করেন। 'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি দেওঘরে থাকতেই কবি রচনা করেন।

'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতা 'দেওঘরে' উদ্ধৃত করা হল :—

[স্বর্গত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে]

হেথা, গাছের ফাঁকে টুকরা আকাশ, মউল-শালের সবুজভিড়,
উঠেছে দূর মাঠের কোণে ময়ূর-কণ্ঠ 'ত্রিকূট'-শির ;
পটে আঁকা তরুর শিরে চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরী,
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ—লাখ' পাখির গিট্‌কিরী।

সামনে জরির ফিতায় বোনা জলের ফণা ফেনিয়ে ধায়'
তটিনীটির নর্ম-নটন ঊর্মি-নূপুর তটের ছায়।

জমাট মসীব খণ্ডতলে ফলে ভরা পিয়াল-বন,
টিলার উপর ছায়া-আলোক-উধাও ছুট্‌ত বালক-মন।
ঝকমকিয়ে হীরের ঢেউয়ে শিউরে ওঠে ঐ সায়র ;
বিমল জলে ঘোমটা খোলে পদ্মকোরক রক্তাধর—
তোমার পাশে হেথায় ব'সে, মানস-লেখা ফুটিয়েছি,
পাখির মুখে খেয়াল শুনে সকাল-বিকাল কাটিয়েছি।

হে প্রকৃতির ভক্ত-দুলাল, হে কবিতা-বিভোল-প্রাণ,
বাণীর চরণ-শরণ-মধু দ্বিরেফ্ সমান করতে পান।
বনের শিরে শিহরিলেই উষার হাসির আবীর-বান,
মঞ্জুশ্লোকে গুঞ্জরিতে বীণাপাণির স্তোত্র-গান।

শোনো-শোনো তেমনি সুরেই পাহাড়-চূড়ে ডাকছে কে—
ধ্যানের দেশে আছিস কে আয়, আয় রে চ'লে সব রেখে।
উঠছে ভেসে নয়ন-তারায় হারানো সেই কোমল মুখ,
পুরানো সেই পথের আলো, ফুরানো সব দুঃখ-সুখ।

আজকে তোমায় অথির-উতল ডাকছি কিশোর-বন্ধু মোর,
স্বপনপুরীর ওপার থেকে মুছাও এসে আঁখির লোর।
প্রবাসের এই কান্নাহাসি, ক্ষতিলাভের গণ্ডগোল
চিত্ত দোলায় আজকে তোমার দেয় না বন্ধু, রুদ্র দোল।

জাদুকরের মন্ত্রে সখা মিশিয়েছিলে ঘর ও পর,
বুঝেছিলে ভালোবাসাই বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ বর ;
মরূদ্যানের মতন মধুর লাগত তোমার স্নেহের কোল,
আজও প্রাণের মর্ম্মমূলে মুখর তব কণ্ঠরোল।

অস্ত তোমার সাধন-পন্থ কোন্ দিগন্ত-অন্তরাল ?
অমৃতেরি মেরুর বুকে হারিয়েছ ভাই দিক্ ও কাল।

এসো গো আজ চির-উদার, তৃপ্তি-সুধায় বুক ভরি'—
মুছাও সখা আঁখি-ঝরা ফুলের উজল মঞ্জরী।

ধানদূর্বা কাব্যগ্রন্থটি করুণানিধানের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থটি কবি "পরম পূজনীয়, প্রধান বিচারপতি, শ্রীল শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী মহোদয়েষু"কে একটি কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় কবিবন্ধু সতীশচন্দ্র বাগচীর মাধ্যমে। কবির নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় সতীশচন্দ্র বাগচীর মধ্যস্থতায় স্যার আশুতোষের আনুকূল্যে কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের কর্মচারী হিসাবে মাসিক ১০০ টাকা বেতনের চাকরি লাভ করেন। স্যার আশুতোষের কাছে করুণানিধানের কবি-প্রতিভা অজানা ছিল না। তাঁর কথায় "করুণা গুণী লোক। ওর আসল কাজ হল কবিতা লেখা।" বাইশ বৎসর চাকুরি করে কবি ষাট বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষের দয়া কবি চিরদিন মনে রেখেছেন। কবি বলতেন, "আশুতোষ ঐ সময় চাকরি না দিলে, না খেয়ে মরতাম।" ধানদূর্বা কাব্যগ্রন্থটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গের মাধ্যমে কবি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞান-অঞ্জন-ধন্য-নয়ন কীর্তি বিরাট্ পুণ্য-শ্লোক,
ইচ্ছা তোমার, শক্তি তোমার নিত্য বিজয়-যুক্ত হোক্।
দিব্য তোমার গুণ-গৌরব-শুভ্র যশের মুক্তাহার
মুক্ত-বেণীর দীপ্তি বিলায় দেশ-পরদেশ সিন্ধু পার।
উপমা-অতীত পৌরুষ তব, সাধনা তোমার হোক সফল।
শঙ্কা-হরণ তুমি আশুতোষ, বন্দি তোমার চরণতল।

বিদ্যা-সুধার রস-অভিষেক-তৃপ্ত তোমার প্রাণ উদার,
বক্ষে-দয়ার মন্দাকিনীর সর্ব-পাবন স্বচ্ছ-ধার।
নবীন যুগের নব রাজর্ষি, জ্বলে তব তেজ হোম-শিখায়,
শীর্ষে উজল প্রতিভা-গঙ্গা, ললাটে অমৃত-টীকাটি তায়।

লোক-মঙ্গল-কল্পে তোমার অক্ষয়-অতুল আত্মবল,
দেশ জননীর শ্রেষ্ঠ তনয়, বন্দি তোমার চরণতল।

জন-শিক্ষার ভিত্তি-পাষাণে সৌধ তুলেছ, চূড়ায় যার,
সূর্য-কান্ত মণির দীপালি হরে ভারতের অন্ধকার।
শ্বেতাম্বরার রত্নবেদীতে প্রতীচ্য জ্ঞান তপস্বীর
পূজার অর্ঘ্য পুঞ্জিত করি' সার্থক তুমি কর্মবীর।
হে অদ্বিতীয় পুরুষ সিংহ, নির্ভীক্ তব পণ অটল,
ওগো বরেণ্য, হে অপরাজেয়, বন্দি তোমার চরণতল।

মাতৃভাষার মন্ত্র দ্রষ্টা, সত্য-ন্যায়ের মর্যাদায়,
অশ্বমেধের অশ্ব তোমার তুঙ্গ অচল লঙ্ঘি' ধায়।
ছন্দে ভাষায় কুলায় না হায় রচিতে তোমার স্তোত্রগান,
নিবেদিতে মম মানস-ভক্তি কোন সপ্তকে তুলিব তান?
অর্পিনু আজি অঞ্জলি ভরি' সচন্দন এ বিল্বদল,
ধর এ অর্ঘ্য, চির-কৃতজ্ঞ বন্দিছে ওই চরণ-তল।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী তাঁর বাগচী এণ্ড সন্স-এর মাধ্যমে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতনরী প্রকাশ করেন। শতনরী কাব্য চয়নিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৩০। এই কাব্যগ্রন্থটি কবি "সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিবরেষু"কে একটি কবিতায় উৎসর্গ করেন।

পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮ সালে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত ও কালিদাস রায় সম্পাদিত 'শতনরী' তে এই উৎসর্গের কবিতাটি "মর্মপথে" পর্যায়ে সংকলিত হয়।

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি করুণানিধানের পরিচয় হয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মাধ্যমে। সুধীন্দ্রনাথের সহায়তায় করুণানিধান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কবি সুধীন্দ্রনাথের প্রভাতী বৈঠকে প্রায়ই উপস্থিত হতেন। আবার সুধীন্দ্রনাথও কবির বাড়িতে প্রায়ই উপস্থিত হতেন। উৎসর্গের কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের প্রতি কবির বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এই কবিতায় করুণানিধান যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম ব্যবহার করেছেন।

নমি তোমা কবি ঋষি, বরনীয় অন্তরঙ্গ মোর,
তোমার বিহনে আজি—ক্ষ্যাপা চোখে জলের লহর।
কে ভুলিবে সোমকান্তি আকাশের সম নিরমল?
কার কাছে যাবো ওগো, কে ফুটাবে মানস কমল?
স্তিমিত তিমিরে যবে কা'লো হয়ে আসে দিগন্তর,
পথের ঘরের দ্বারে শুনি তব শুভ কণ্ঠস্বর।

দাক্ষিণ্যের বেদীতলে সঙ্গোপন স্নেহের উৎসব
অবসানে—বাজে প্রাণে মৃত্যুর উদাস ভেরী রব।
পড়ে নাই পূর্ণচ্ছেদ ছেঁড়ে নাই বন্ধনের রাখী,
মহাসত্য মানি যারে—সে কি মিথ্যাকথা? পলকের ফাঁকি।
ভুলিতে পারিনি গুণী, কবির অমরাবতী লোকে
মর্তের অমৃত স্মরি' আজো তব জল আসে চোখে।

ভোলনি মোদের বন্ধু, শুনিতেছ বিলাপের তান,
ভুলায়েছ বহু জ্বালা দুঃখে যবে বিধুর পরান ;
তোমার চরণ ধূলি পড়িত এ কাঙাল কুটীরে ;
মঙ্গল বিভূতি নিয়ে পঁহুছিতে রোগাতুর শিরে।
ভাঙেনি ধেয়ান তব জনতার কলকোলাহল,
'সাধনা'র পদ্মাসনে বাণী তপে ছিলে অবিচল।

'চিত্রালির'র আলোছায়ে, 'বৈতানিকে' 'দোলা' 'মঞ্জুষা'য়,
'প্রসঙ্গে', 'করঙ্কে' তব রসধারা বিলাইয়া যায়।
মিশে যথা সরস্বতী 'প্রভাস' এর সাগর সলিলে,
তেমনি মিশিয়া গেছ দিনান্তের দূর মহানীলে।
দেখা দিয়াছেন তোমা প্রেমঘন অরূপ বিগ্রহ,
যাঁহার লাগিয়া হেথা সহিয়াছ প্রবাস-বিরহ।
সাজায়ে মাটির দীপে আনিয়াছ আরতি-পশরা,
রুদ্ধ হয়ে গেছে শঙ্খ, রন্ধ্রে তার অশ্রুকণা ভরা।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'রবীন্দ্র আরতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ এ। কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন ঃ—"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণধূলি লইয়া 'রবীন্দ্র আরতি' প্রকাশ করিলাম। ইহার কতিপয় কবিতা তাঁহার ভাল লাগায় এই গ্রন্থখানিতে তাঁহার অমর নাম সংযোগ করিবার অনুমতি ভিক্ষা পাইয়াছি।" এই কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ও শেষ কবিতা যথাক্রমে 'রবীন্দ্র আরতি' এবং 'পুষ্পাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখিত।

'রবীন্দ্র আরতি' কাব্যগ্রন্থটি কবি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সতীশচন্দ্র বাগচীকে একটি কবিতায় উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের এই কবিতায় বন্ধু সতীশচন্দ্রের প্রতি কবির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

ভালোবেসেছিনু কবে কিশোর বেলায়,
মনে মনে রসায়নে এক হ'য়ে যায়।
নানা দানে মোরে তুমি করেছ ভূষিত,
তব গ্রন্থাগার হ'তে পেয়েছে তৃষিত
চিরন্তন সাহিত্যের অমৃত বিলাস,
মানুষের তপস্যার সত্য ইতিহাস।
বাক্যই সে অবতার, সেই দেবতার
ধ্যান-যোগে রসলোকে ভুলেছে সংসার।
চিনেছি তোমারে গুণী, হে সৌন্দর্য-লোভী,
ললিত-কলার কুঞ্জে স্বপ্ন মৌনী কবি।
জীবন হয়েছে ধন্য পুলকে তন্ময়,
তৃপ্ত অনুপম ফলে নাহি তার ক্ষয়।
জাগ্রত-স্বপনে হেরি-মূরতি তোমার,
সব চেয়ে বড় কথা, মিলিব আবার।

কবিবন্ধু সতীশচন্দ্র বাগচী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই সহায়তায় কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারীর চাকরী পেয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র বাগচীর সংস্পর্শে আসার পরে কবির ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। কবি বহুবার বলেছেন, "সতীশই আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে।" সতীশচন্দ্রের বাসভবনেই কবির সঙ্গে তৎকালীন অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের পরিচয় হয়। একত্রে দুই বন্ধু সমুদ্রে সৈকতে ও শৈল চূড়ায় ভ্রমণ করেছেন। সতীশচন্দ্রের গ্রন্থাগার ও আর্ট

গ্যালারির মাধ্যমে কবি বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। মধুপুরে সতীশচন্দ্রের "বেলভূ" (Bellevue) বাগানবাড়িতে দুই বন্ধু মাঝে মাঝে অবসর যাপন করতেন। করুণানিধানের মানসজীবন এবং কবিজীবনের বিকাশের পথে সতীশচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য।

করুণানিধান-সতীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের একটি প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় কবির শেষ জীবনের অপ্রকাশিত "বন্ধু স্মরণে" কবিতায়।

করুণানিধান তাঁর 'প্রসাদী' (১৯০৪) কাব্যগ্রন্থটিও উৎসর্গ করেছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ সতীশচন্দ্র বাগচীকে।

উপহার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী

অশেষপ্রণয়েষু

ভাই,

আজ আমার, বহুদিবসের আশা পূর্ণ হইল। তোমার করে 'প্রসাদী' অর্পন করিলাম।

তোমারি

করুণানিধান

যতীন্দ্রমোহন বাগচী
(১৮৭৮—১৯৪৮)

[নাগকেশর (১৯১৭)]

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর 'নাগকেশর' কাব্যগ্রন্থটি দুই পঙ্‌ক্তির একটি কবিতায় উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে।

উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন—

"যাহার স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া এই গ্রন্থেব অধিকাংশ কবিতা বচনা সম্ভব হইয়াছে ঃ—

সেই
অশেষ গুণের খনি
হৃদয় ধনের ধনি
কবি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
মহোদয়ের কবকমলে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

মহালয়া, ২৯ আশ্বিন, ১৩২৪ গ্রন্থকার
১০।১ আরপুলি লেন
কলিকাতা

কর্মজীবনে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ ও বর্জন এর পরে যতীন্দ্রমোহন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়-এর ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। জগদিন্দ্রনাথ নিজে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যানুরাগই ছিল উভয়ের পরিচয়ের সূত্র।

রবীন্দ্রানুরাগীদের সাহিত্য পত্রিকা 'মানসী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে। ১৩২০ সাল থেকে মানসী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পান জগদিন্দ্রনাথ। কিন্তু এই পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার মূল দায়িত্বভার পালন করেন যতীন্দ্রমোহন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৮৮২—১৯২২)

[অভ্র আবীব (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৭)]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিংশ শতাব্দীব প্রথমদিকে বাংলা সাহিত্যে একজন জনপ্রিয কবি। ছন্দেব যাদুকব অভিধায পবিচিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেব সাহিত্য সৃষ্টি বিশাল ও বিচিত্র

১৯১৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথেব একাদশ কাব্যগ্রন্থ 'অভ্র আবীব' প্রকাশিত হয। এই কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ কবেন "স্বনামধন্য লেখক ও সহৃদয বন্ধু শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায কবকমলেষু' কে উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ ঃ

স্বনামধন্য লেখক
ও
সহৃহদয বন্ধু
শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায
কবকমলেষু

বন্ধু,

দবাজ তোমাব হাত
তুমি দিলে সওগাত,
কি আছে তোমারে দিতে গরীব কবিব?
হাতে যা দিতেছি তুলি
এ শুধু বঙীন্ ধূলি
দু'মুঠা ডালিম-ফুলি অভ্র-আবীব।

সখ্য গর্বিত
সত্যেন্দ্র

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সত্যেন্দ্রনাথ যাঁদের বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। চারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম উপন্যাস লেখক, রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ও গবেষণাধর্মী বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

হাস্যরস সত্যেন্দ্র সাহিত্যের প্রিয় রস। তাঁর রঙ্গ ব্যঙ্গের দুখানি কাব্যগ্রন্থ হল 'হসন্তিকা' ও 'রঙ্গমল্লী'। হসন্তিকা মানে ছাইদানী। কবি ঐ নাম দিয়েছেন কারণ—

'হসন্তিকা—আঙারদানী, চানকে তোলে মন
আঁচ লাগিলেও আরাম আছে, মজলিশীরা কন।'

হসন্তিকা কাব্যগ্রন্থটি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন বাংলা গদ্যের শক্তিশালী লেখক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে। উৎসর্গ পত্রে লেখা "সরস সাহিত্য সংরচনায় সুকৌশলী, সাহিত্যবস্তুর বিচার বিচক্ষণায় সুকৌশলী, সবুজপত্রের সমঝদার সম্পাদক, সুধী, সুরসিক ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের স্বহস্তে সাদরোপহার" প্রদান করছেন "সদৈবানুমত কিন্তু ভূমিকা লিখন বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী অথচ সুহৃদ শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।" লক্ষণীয়, কবি এখানে অনুপ্রাস অলংকারের সুন্দর প্রয়োগে প্রমথ চৌধুরীর গুণের সবিস্তার বর্ণনা করেছেন এবং নিজেকেও বিনয়াবনত ভাবে প্রকাশ করেছেন।

হসন্তিকা গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পত্রপত্রিকায় 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে প্রকশিত হয়েছিল। হসন্তিকা গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় কবি লিখেছেন "শ্রী নবকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রজ্জালিত ও শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা ফুৎকৃত।" প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঘনিষ্ঠতা সুপরিচিত। প্রমথ চৌধুরী ও তার 'পাদচারণ" কবিতা গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন।

'হসন্তিকা' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্র ঃ—

অদ্ভূত-ভূমিকা
বা
ফুৎকার

"দোয়াতে রয়েছে কালি, কলম হাতে
কি লিখি ভেবে না পাই আচোটপাতে।"

অত্যাগ-সহন বন্ধু! অভিন্ন হৃদয়
ওহে শ্রী নবকুমার কবিরত্ন মহাশয়।
সমপ্রাণ সখা। মোর দোস্ত হম্‌দম্।
মোরে ভূমিকা ফর্ম্মাশ ক'রে ক'রেছ জখম।
আমি বলি হেন কাজ আমারে কি সাজে?
দ্যাখো বন্ধু হে। এ কাজ মোরে লাঠি হেন বাজে।

ভূতপূর্ব্ব-কেওকেটা লিখুন ভূমিকা,
ক'সে লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টীকা ;
কানুন-গোয়েরা কাব্য-কাননে চরুক,
যত কামারে কুমোর-বৃত্তি সানন্দে করুক।
একক্রিয় মিত্র! তুমি মোরে ছুটি দাও,—
শোনো কেওকেটা দিয়ে দীর্ঘ ভূমিকা লেখাও ;—
হাসি কারে বলে তাহা লিখুক সে তেড়ে,—
মেরে মাড়িতে হাসির জড়। মোরে দাও ছেড়ে।
তাছাড়া কেতাব তব হাস্য-রসাত্মক,—
হা হা ভূমিকা করিয়া হাসা?—সে যে মারাত্মক!
তদুপরি কাগজের চড়িয়াছে দাম ;—
এবে কাগজের অপব্যয়?আমি নারিলাম।
হেসে নাও তবে বন্ধু বিনা ভূমিকায়,
অদ্ভুত-ভূমিকা-কর্ত্তা কবির এ রায়॥ ইতি—

পৌষ পার্ব্বন
তের-শ' তেইশ}

সদৈবানুমত
কিন্তু
ভূমিকা-লিখন-বিষয়ে ভিন্ন-মতাবলম্বী
অথচ সুহৃদ্
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সরস সাহিত্য সংরচনায়
সু-কৌশলী,
সাহিত্য-বস্তুর-বিচার-বিচক্ষণায়
সু-কৌশলী,
সবুজ-পত্রের
সমঝদার-সম্পাদক,
সুধী,
সুরসিক ও সুপণ্ডিত
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের
স্বহস্তে
সাদরোপহার

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
(১৮৮৭—১৯৫৪)

[মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০)]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র কাব্য পবিমণ্ডলের অন্তর্গত কবিদের মধ্যে একজন অন্যতম কবি। যতীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন বাগচীব কবিতার বিশেষ অনুবাগী পাঠক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সখ্যও ছিল গভীর।

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মানসী' পত্রিকাতে যতীন্দ্রনাথের 'শিবের গাজন' (মরীচিকা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতা প্রকাশকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্ব যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমান অন্তরঙ্গ ছিল। যতীন্দ্রমোহনেব সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয়ের বিবরণ যতীন্দ্রনাথ 'পূর্বাচল' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩৫৪) 'মিতার স্মরণে' রচনায় লিখেছেন—"মানসীতে প্রেরিত শিবের গাজন কবিতাটি পড়ে তাঁর (যতীন্দ্রমোহনের) ভাল লেগেছিল। সেইজন্য কৃষ্ণনগবে কোন কাজে এসে সে আমার ভালবাসায় আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এল। তাঁর অনুরোধে আমি আমার পুঁজি থেকে কয়টি কবিতা তাঁকে সসঙ্কোচে পড়ে শোনালাম। কবিতা শোনবার পর সে আমায় 'মিতে' সম্বোধন করে একেবারে জড়িয়ে ধরল।"

মিতে যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম প্রীতি ভালবাসা যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধুর অভিনন্দন দিনে', 'মিতার জন্মদিনে' ও 'মিতা কবি যতীন্দ্রমোহন' কবিতায় প্রতিফলিত।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে 'রসচক্র'এর পক্ষ থেকে সাহিত্যিক জলধর সেনের সভাপতিত্বে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৬ ভাদ্র একটি জন-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সভায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মিতা কবি যতীন্দ্রমোহন' কবিতাটি আবৃত্তি করা হয়।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'মরীচিকা' (১৯২৩) এবং 'মরুশিখা' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ দুটিকে উৎসর্গ করেন সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে।

মরীচিকা

উৎসর্গ ঃ সুকবি শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী বন্ধুবরেষু

খেয়ালের বশে হারাইলে পথ
এ মরুহিয়ার 'পরে ;—
দাহন রসের গহন সাধন,
ঊষর তৃষ্ণার সজল স্বপন—
মরুমর্ম্মের মরীচিকা ধন
বন্ধু, তোমারি তরে।

যতীন।

মরুশিখা

উৎসর্গ ঃ সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী করকমলেষু,—

বন্ধু, মগজের মাঝে যতই ধোঁয়াক প্রতপ্ত মরুশিখা,—
কাগজে উঠিলে মূল্য তাহার বড় জোর পাঁচ সিকা!
তবু, জ্বলে' জ্বলে জমিল যা প্রাণে, ফেলিতে সে সব ছাই,
তোমার মতন ভাঙা কুলো সখা আমার ত দুটি নাই।
তুমিই শোনো গো চির-মরুচারী মরীচিকা-প্রিয় মিতা,
জীবন-মরুক্ষেত্রে শ্রীমদ্-দুর্ভাগবদ্ গীতা।

যতীন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁর 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থটি 'কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রিয়বরেষু'কে উৎসর্গ করেছিলেন।

মার্চ, ১৯০৭এ হাজারিবাগের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী চারুচন্দ্র গুপ্তের কন্যা জ্যোতির্লতা দেবীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। যতীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে যিনি সর্বাধিক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন—তিনি হলেন কবির স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্লতা দেবী। কবি প্রতিটি কবিতা রচনা করে সর্বাগ্রে স্ত্রীকে পড়ে শোনাতেন। 'মন্ত্রহীন' কবিতাতে কবি তাঁর স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন।

"হে আমার জ্যোতি হে আমার সতী
গৃহিনী, সচিব, সখী হে প্রিয়া।"

ভারতীয় সতী নারীর আদর্শে জ্যোতির্লতা দেবী প্রতিদিন সকালে উঠে স্বামীকে প্রণাম করতেন। যতীন্দ্রনাথ স্ত্রীর এই আচরণকে অনেক কবিতায় স্মরণ করেছেন।

"প্রভাতে উঠিয়া সম্বরি বাস
হাসিয়া সলাজ হাসি
পুষ্পের প্রায় পড়ি' মোর পায়
নীরবে কহিলে—'আসি" (শুভ ফাল্গুনী তিথি—সায়ম)

আরেকটি কবিতার অংশবিশেষ

"শেষ হল, নিশা, আশিস মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া ;
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া
চলি' যায় শুভখন" (নির্বাচন—ত্রিযামা)

স্ত্রীকে লেখা যতীন্দ্রনাথের চিঠির অংশবিশেষ পাঠ করে যতীন্দ্রনাথ ও জ্যোতির্লতা দেবীর সম্পর্কের গভীরতা বোঝা যায়। "অনেক কথা সঞ্চিত হচ্ছে—কবে বলবার সুযোগ পাব। এতদিন একলা কি আমি পূর্বে কোন সময় ছিলাম? ঠিক মনে পড়ে না।...পুরনো কলমে কবিতা আসছে। শেষ করে কোথাও পাঠাতে পারছিনে। পাশ করে কে?"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'মরুমায়া' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবিপত্নী 'জ্যোতি'কে।

মরুমায়া

উৎসর্গ

মাথার ঘাম ও প্রভু পদধূলি
গুলিয়া, ললাটে তিলক লেখি'
আমি আনি টাকা,—তুমি গো লক্ষ্মী
বাজাইয়ে দেখ খাঁটি কি মেকি।
মনে, গৃহকোণে কি আবর্জ্জনা
নিত্যই কর সম্মার্জনা।
সত্যই কহি, অয়ি মোর
বহিরন্তর গৃহ গৃহিনী।
তব মার্জ্জনা বিনা এ মূঢ়ের—
রহি যেত সব শ্রীহীনই।

এ মরু-প্রাণের তুমি মেঘমায়া,
নিদাঘ-তরুর তুমি তলছায়া ;—
ছায়ার মতন মায়ার মতন
তুমিও কি মোর ক্ষণিকা ?—
—ক্ষণিক তুষ্ট ভাগ্যদেবীর—
অমৃত প্রসাদ কণিকা ?—
নিরুপায়, তবে নিরুপায়
কবির না আর হায় হায়,—
মরীচি বাঁধন বেধে দ্যায় যথা
তরুসাথে তরুছায়া,
এ মরুমায়ার বেদনে বাধিনু
মরু আর তার মায়া।

---যতি

[স্বপনপসারী (১৯২১), বিস্মরণী (১৯২৬), স্মরগরল (১৯৩৬), হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১), রূপকথা (১৯৪৫), ছন্দ চতুর্দশী (১৯৫১)]

কবি মোহিতলাল মজুদার রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে একজন অন্যতম কবি এবং খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক ।মোহিতলালের প্রথম কাব্য 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী' প্রকাশিত হয় ১৯২১এ। এই কাব্যগ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে নির্দিষ্ট কারোর নাম না করে কবি কেবলমাত্র 'তোমাকে' বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যগ্রন্থটির উৎসর্গের কবিতা থেকে বোঝা যায় কবি তাঁর স্ত্রী তরুলতা দেবীকে কাব্যটি উৎসর্গ করেন।

'স্বপনপসারী' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় কবি লিখেছেন—

উৎসর্গ

তোমাকে—

এখনো হয়নি সাঙ্গ শ্যামলের আলিপনা এপারের শুভ্র সিকতায়,
বেদনার সিন্ধু হ'তে জল সেচি' এখনো যে ফুল-ফল রচিতেছি তায়!
মোদের কুটিরতলে শতভগ্ন-রন্ধ্রপথে সঙ্কুচিত রবি-শশিকর
বিথারি' আলোর যাদু, মলিন মাটির রূপ আরো যে গো করে মনোহর!
এখনো তোমার চোখে, প্রথম সে ফুলশেজ-বাসরের অপরূপ নিশা
চমকিয়া ওঠে কভু, এ হৃদয়ে আজো তাই রহিয়াছে অমৃতের তৃষা।
সজন এ বেলাভূমি সেদিনের মত নহে, তবু সেথা এখনো দু'জন
সকল কল্লোল মাঝে নীরব-নিকুঞ্জ গড়ি' করিতেছি নিভৃত কূজন।
জন্ম-মৃত্যু-জরা বহি' চলিয়াছি যে আঁধারে তার যদি নাহি থাকে শেষ,
সেই ভয়ে সারারাতি প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে চেয়ে থাকি মুখে নির্ণিমেষ।
আজ সে পূর্ণিমা নাই, নাই সে ফাগুনের ফাগে-রাঙা অসীম ভুবন,
বিভোর যাহার রূপে ভরেছিনু একদিন পসরায় রঙীন স্বপন ;

তবু সে নিশার শেষে তোমার নয়নে হেরি স্বপনের সেই ঘুমঘোর ;—
এখনো জাগোনি যদি, ওগো আর জাগিয়ো না—একেবারে হোক নিশিভোর।
আমিও তাহারি মোহে সেদিনের সেই ফুল আরবার তুলে দিনু হাতে,
মনে ভাবো—সেই আমি, সেই তুমি, সেই গান শুনিতেছ সেই মধুরাতে!

নীলক্ষেত, রমনা
২৬ এ ফাল্গুন, ১৩৪৮

মোহিতলাল 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন মোহিতলালের অগ্রজ কবি এবং রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কলকাতায় একই অঞ্চলে উভয়ের বসবাসের কারণে মোহিতলাল এবং করুণানিধানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় করুণানিধান অমূল্য বিদ্যাভূষণের 'বাণী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মোহিতলালের 'বিফল' নামে একটি কবিতা ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। করুণানিধানের কাব্যচর্চার প্রতি মোহিতলাল খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে মোহিতলাল করুণানিধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'বিস্মরণী'র উৎসর্গের কবিতায় মোহিতলাল এই ঋণ স্বীকার করেছেন।

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর-পর,
মেলেনি মনের মণি, বর্ষ পরে-বর্ষ যায় ফিরে

শাল্মলীর রক্ত ভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর।
নরত্ব দুর্ল্লভ জানি, সুদুর্ল্লভ কবি-কলেবর—
সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু সৈকত সমীরে,
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্ত পদে সুন্দরের তীর্থ অভিলাষে,
সমুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!

জিজ্ঞাসিনু কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুবা মর্তের অধিক।
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান।

মাঠের বাড়ী, কাঁচড়াপাড়া
শ্রী পঞ্চমী, ২৩ শে মাঘ, ১৩৩৩

মোহিতলাল 'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থটি 'শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে বন্ধুবরেষু'কে উৎসর্গ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন সুশীলকুমার দে। সুশীলকুমারের আনুকূল্যে মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে এই দুই কবির প্রায়শ দেখা-সাক্ষাতের ফলে দুজনের ঘনিষ্ঠতা হয়। মোহিতলাল 'শ্রী মধুব্রত' ছদ্মনামে সুশীলকুমার দের 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century' গ্রন্থের সমালোচনা করেন।

'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

এ নহে সে দ্রাক্ষারস, আসব শীতল---
যৌবন-যামিনীযোগে দোঁহে মুগ্ধ প্রাণ
পিয়েছিনু এক সুখে, একটি সে গান
গুঞ্জরি স্খলিত-ভাষে, দুরাশা-চপল;
একদিন আছিল যা সফেন-তরল,
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস! সে মধুর ঘ্রাণ
আছে কিনা দেখ দেখি? পাত্র-শেষ পান—
তবু কি সহিবে কণ্ঠে এ স্মর-গরল?

গরল?—এ গ্লানি মিথ্যা জানি, তবু তারে
ঐ নামে আজো হায় বাসি যে মধুর!
পিপাসার জ্বালা যত, বারি সে প্রচুর
অধর সরস করে নয়ন—আসারে!
সেই জ্বালা নিবে আসে দেহ-দীপাধারে—
আমি গাই, তুমি শোন তারি শেষ সুর।

মাঠের বাড়ি, কাঁচরাপাড়া
রাসপূর্ণিমা, ১৩৪৩

মোহিতলাল 'হেমন্ত গোধূলি' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ভারতী পত্রিকার সম্পাদক (১৯১৫ ২৪) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন ১৯২৯ সালে। হেমন্ত গোধূলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪১এ। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কবি মোহিতলাল তাঁর স্মরণে গ্রন্থটি উৎসগ করেন। কবির মনের বিষাদ উৎসর্গ-কবিতায় কবি প্রকাশ করেছেন।

ভারতী পত্রিকায় লেখা প্রকাশকে কেন্দ্র করেই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় এবং সখ্য। সমবয়সী সাহিত্যসেবী হলেও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে এই সখ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

হেমন্ত গোধূলি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের কবিতা ঃ --

বন্ধু, তোমারে ভুলি নাই আজও, যদিও দুদিন তরে
দেখা হয়েছিল মর্ত্ত্য-মরুর পথহীন প্রান্তরে,
দিগন্তরের কপিশ আকাশে ছিল না কিছুই আঁকা,
সহসা হেরিনু বিটপীর-শিরে আধখানি চাঁদ বাঁকা।

সন্ধ্যা-মেদুর ছায়াখানি যেথা ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সাথে
মিলাইয়াছিল, দেখা হ'ল দোঁহে সে মোহের মোহানাতে
শুধালে না কিছু—জননান্তর—সৌহৃদ যেন স্মরি'
আপন আসনে আগন্তুকেরে বসাইলে হাত ধরি'।

তিনটি সন্ধ্যা, দুইটি ঊষার মাধুরী মদিরা পিয়ে
মোর হেমন্তে বসন্ত এল স্বপন পসরা নিয়ে ;
পরম আদরে সে ফুল-মুকুল তুলি' লয়ে সবগুলি
তুমি 'ভারতী'র অঙ্কে রাখিলে, কাঁপিল না অঙ্গুলি।

তার-পর-হতে ঘাট হতে ঘাটে ফিরিনু পসরা নিয়ে,
গোধূলি আঁধারে সে আঁখি উদার গেল পুন মিলাইয়ে।
স্তব্ধ গভীর নিস্তরঙ্গ বিস্মরণীর নীর—
তারি তীরে তীরে ঘনাইল ছায়া তারাময়ী রজনীর।

পূর্ব্ব-গগনে চেয়ে থাকা মিছে শুকতারকার লাগি'—
জানি, এ রজনী পোহাবে না হেথা, কেন আর বৃথা জাগি!
শেষ গানগুলি গুছাইতে গিয়ে সহসা পড়িল মনে—
প্রথম মালাটি দিতে গিয়ে তবু দিই নাই কোন্ জনে।

হাতে তুলি' দিতে নারিনু আজিও, ক্ষোভ নাহি তবু তায়—
গভীর নিশীথে এপারের কথা ওপারেও শোনা যায়!
ডেকে বলি তাই—বন্ধু! তোমারে পথশেষে স্মরিলাম,
গানের খাতার শেষ পাতাটিতে লিখিনু তোমার নাম!

কলিকাতা
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

নানা সময়ে ছোটদের জন্য লেখা কিছু কবিতা নিয়ে কবি মোহিতলাল তাঁর 'রূপকথা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি কবি তাঁর চিরদিনের মতো হারিয়ে যাওয়া দুই কন্যা অমিয়া ও অরুণাকে উৎসর্গ করেন।

অমিয়া ও অরুণা,

চোখ বুজে আজ খুঁজছি তোদের বুকেব তলার অন্ধকারে,
কোথায়-আছিস আইস কি নেই সে কথা কেউ বলতে নারে।
মন যে বলে অট্টহেসে 'মিথ্যা সে সব ছায়ার মায়া',
প্রাণ কেঁদে কয়, দেখছি তবু সেই ছায়ারি অচল কায়া।
আছিস তোরা-আছিস বেঁচে আমার নিশাস চোখের জলে,
থাকবি নে আর, ডুব্‌ব যখন আমিও সেই আঁধার তলে।

আজকে শুধুই নাম দুটি এই পুঁথির পরে দিলাম লিখে,
কি বলে যে আশিস্ করি—জানিনে সেই বচনটিকে!
'বেঁচে থাকো' এমন কথা বাপের মুখেও নেই যে আজ।
মানুষ যদি এতই পাপী—বিধির তাতে হয় না লাজ?
ধর্ মা তোরা তোদের বাপের বুক-ভাঙ্গা এই ব্যথার দান,
তোদের কথাই 'রূপকথা' যে—এমনি আমি ভাগ্যবান!

মোহিতলাল 'ছন্দ চতুর্দশী' কাব্যগ্রন্থ কবির আত্মীয় প্রয়াত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের স্মরণে উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রয়াণের (১৯২০) অনেক

পরে ছন্দ চতুর্দশী প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রশস্তিমূলক ষোলোটি সনেটের একটি ক্ষুদ্র সংকলন 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' নাম দিয়ে ১৯১২ সালে মোহিতলাল প্রকাশ করেন। এটি মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'ছন্দ চতুর্দশী'র উৎসর্গের কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন স্মরণে

হে দেবেন্দ্র, কি সুন্দর তোমার সনেট—
কাব্যলক্ষ্মী সাজে যেন বাসন্তী দুকূলে
মদন-মোহিনী যেন প্রদানিল ভেট,
গোলাপের স্বপ্ন যেন হেমন্ত মুকুলে!
একবাটী পূর্ণ যেন নারিঙ্গীর রস!
কবিতা বিহগী যেন বসে ক্ষুদ্র ফুলে
নুয়ে পড়ে বৃন্ত তার বেদনা বিবশ!
গোলাপী আতর যেন!—একরাশ চুলে
এক ফোঁটা করি' দেয় সুরভি মধুর!
দখিনা বাতাসে রাখি বাতায়ন খুলে -
তবুও তেমনি বাস অলকে বধূর,
সারারাত্রি বিছানায় গন্ধ ভুর-ভুর!
বঙ্গ কবি ভারতীর সিত-সিঁথিমূল
সনেট সিন্দুরে কবি করেছ অতুল!

দিলীপকুমার রায়

(১৮৯৭—১৯৮০)

[সাঙ্গীতিকী (১৯৩৮), অঘটন আজো ঘটে (১৯৫৭), সুধাঞ্জলি (১৯৬৮)]

কবি, নাটককার দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায় ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক, কবি, ঔপন্যাসিক। তাঁর কবিতাগুলি ছিল মূলত ভক্তি রসাশ্রিত। ইংরাজি ভাষাতেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরাজী ভাষায় লেখা 'Among the Greats' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পরিব্রাজক লেখক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দিলীপকুমারের স্নেহধন্য। দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় দিলীপকুমার রায়ের লেখা প্রকাশিত হত। এই সূত্রে দিলীপকুমারের সঙ্গে উমাপ্রসাদের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। উমাপ্রসাদ ছিলেন দিলীপকুমারের গানের ভক্ত। তাঁর নানা সঙ্গীতাসরে উমাপ্রসাদ উপস্থিত থাকতেন। দিলীপকুমার তাঁর "সুধাঞ্জলি" কাব্যানুবাদ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন 'শ্রীল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু'কে।

এই প্রসঙ্গে উমাপ্রসাদ তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ "অ্যালবাম পুনশ্চ"য় দিলীপকুমারের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন—"কিছুকাল পরেই দাক্ষিণাত্যে ঘুরতে ঘুরতে পুনায় তাঁর হরেকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে হাজির হই। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় ও ইন্দিরা দিদির আন্তরিক অপরিসীম আদর যত্নের মধ্যে পরম আনন্দে কয়েকদিন কাটাতে থাকি, এবং তা একবারই নয় কয়েকবারই গিয়ে কাটানোর সৌভাগ্য হয়। মন্টুদা ও ইন্দিরাদেবীর সুমধুর ভজনগানে মনপ্রাণ অপার্থিব তৃপ্তি পায়। এমনি এক থাকাকালে মন্টুদা আমার নামে এই কবিতাটি লিখে তাঁর রচিত ইন্দিরাদেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দী ভজনাবলী—"সুধাঞ্জলি"র কাব্যানুবাদ গ্রন্থখানি "উৎসর্গ" করে আমাকে চমকে দেন ঃ

উৎসর্গ

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

পুণা ১৬

শ্রীল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু,

দার্শনিকের মুখে শুনি : "নয় ভবে কেউ নগণ্য,
প্রতি বিকাশ তাঁরই একটি বিভাব, বিলাস - অনন্য।"
মানি, তবুও গান গেয়ে প্রাণ ওঠেই--যখন পাই দেখা
এমন উদাসীর, ভাবুকের- থাকতে পারে যে একা
মাসের পরে মাস, তার পর সবার সাথেই মিলিয়ে কাঁধ
চলতে উধাও --জন্মমুসাফের - নেই যার ভোগের সাধ,

নেই সুতরাং মাটির বাঁধন, কারুর কাছেই প্রত্যাশা,
সবার মাঝে থাকলেও যার কোনোখানেই নেই বাসা,
অথচ সে খুশখেয়ালে যত্র তত্র ঘর বাঁধে
চমকে দিয়ে সংসারীকে হিমালয়ের সংবাদে! --
(দেবে না? হিমাদ্রিরাজও যার শ্রীনখদর্পণে?)
সর্বোপরি, হয় তন্ময় যে মরমী কীর্তনে,
যে 'শ্রদ্ধাবান" পেয়েছে "জ্ঞান", তাই সাড়া দেয় সত্যি যে
শ্রীমন্তিনীর ধ্যানশ্রুত ভজনগানের ভক্তিতে ;
এমন বিরল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের শ্রীকরে
দিই উপহার "সুধাঞ্জলি"—যার অমৃতনির্ঝরে
তৃপ্ত হ'ত নিত্য সে—যে নামেও প্রসাদ পায় উমা-র,
তাই জেনেছে শ্যাম ও শ্যামা দুই হ'য়েও একাকার।

গুণমুগ্ধ—দিলীপদা"

একই গ্রন্থ একাধিক ব্যক্তিকে উৎসর্গ করার রেওয়াজ বাংলাসাহিত্যে দেখা যায়। দিলীপকুমার রায় তাঁর "সাঙ্গীতিকী" গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তিনজন সঙ্গীতজ্ঞ যথাক্রমে আবদুল করিম, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী মতি বাঈকে।

সাঙ্গীতিকী
দিলীপকুমার রায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩৮

আবদুল করিম (তিরোধান—২৭.১০.১৯৩৭)
সুর-রাজেষু,

হে সুরসুন্দর বন্ধু! ধ্রুবলোক হ'তে তব প্রাণ
বাহিয়া আনিতে মর্ত্যে ছন্দময়ী গগন-জাহ্নবী।
আধ-নিমীলিত তব ধ্যাননেত্রে অধরা-সন্ধান
মন্দ্রিত ধরার তালে অসাঙ্গ-ঝঙ্কারে রূপোৎসেবী!
যা কিছু চাহিতে গুণী, উচ্ছলিতে দীপ্ত প্রতিভায় ;
অমিত সাধনা তব অমিতাভ হ'ত সে-জোয়ারে।
স্বপ্নচারী সঙ্গীতের রত্নাকর! আজি তব পায়
নমি মোরা ভক্ত তব, শিষ্য তব-অশ্রু-উপচারে।
দানব্রতী! নহে তব গীতি-ঋণ শুধু স্মৃতি-শিখা ;
প্রতি প্রেমকণ্ঠে সেই ঋণ হবে মূর্চ্ছনা-মালিকা।

২৮.১০.১৯৩৭

শ্রীমান ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়,

প্রদীপ্ত ঐ সঙ্গীতে কোন চিরন্তনীর জাল বোনা
সাধলে ঐন্দ্রজালিক, এঁকে প্রেমতুলিতে আল্পনা।
নামল তোমার যুবন্ প্রাণে আরাধনার জাহ্নবী ;
তাই প্রতিভায় ফুটল তোমার সুরসাধনার গান-ছবি।

শ্রীমতী মতি বাঈ,

বহিন, তুমারী গীতিবিহারী-মন্দাকিনীকি শান্তি
মেরে অন্তর জপত নিরন্তর—মূর্ছনমীড়কি কান্তি।
অজহু' মধুসুর অম্বর-নূপুর-সঙ্গত-কোমল-নৃত্য
মনবোঁ উছলত মুকতি-কমল-ব্রত, কঙ্কর হোত অনিত্য॥

দিলীপকুমার রায় তাঁর 'অঘটন আজো ঘটে' গ্রন্থটি একটি কবিতায় উৎসর্গ করেছিলেন 'শ্রী কালিপদ গুহ রায় প্রেমিক যোগিবরেষু'কে।

অঘটন আজো ঘটে

দিলীপকুমার রায়

প্রথম সংস্করণ ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৩

উৎসর্গ

শ্রী কালিপদ গুহ রায়

প্রেমিক যোগিবরেষু

সাধনায় কেউ পায় জ্ঞান, কেউ প্রতিষ্ঠা, কেউ ভক্তি,
আরো কত কী—যা অপরে পারে না জানতে
আমরা কিন্তু জেনেছি যে, তুমি পেয়েছ প্রেমের শক্তি
পরকে আপন ক'রে নিয়ে কাছে টানতে।

দিয়েছ শান্তি হে গুপ্তযোগী, কত অশান্ত পান্থে
মুক্তির দিশা দেখায়ে তোমার জীবনের দৃষ্টান্তে।

হরিকৃষ্ণ মন্দিব — স্নেহ-ঋণী
ইন্দিরা নিলয় — দিলীপ
পুনা-৫ — ১৪ই জুলাই, ১৯৫৫

[অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), বাঁধনহারা (১৯২৭), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), বুলবুল (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১), বনগীতি (১৯৩২), গুলবাগিচা (১৯৩৩)]

বাংলা কবিতার অন্যতম ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রকাব্যপ্রভাবমুক্ত কাজী নজরুল ইসলাম কেবলমাত্র বিদ্রোহী কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাম্যের কবি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একজন সোচ্চার কবি. আবার রোমান্টিকতার প্রকাশও পাই তাঁর অনেক কবিতায়, গানে। ১৯৪২ সালে নজরুল চির-অসুস্থ হলেন। তাঁর এই প্রায় স্বল্পকালীন সাহিত্যজীবনে তিনি যে সকল কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁব মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, বাঁধনহারা, বুলবুল, চক্রবাক, চন্দ্রবিন্দু, বনগীতি, গুলবাগিচা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তিনি কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেছেন।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে নজরুলের অগ্নিবীণা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এটি নজরুলের সর্বোত্তম কাব্যগ্রন্থ। অগ্নিবীণায় সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নজরুল গাইলেন মুক্ত জীবনের জয়গান। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থটি নজরুল উৎসর্গ করেন—"বাঙলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রী চরণারবিন্দেষু'কে। উৎসর্গের কবিতার শেষে লেখা আছে "তোমার অগ্নিপূজারী স্নেহ মহিমান্বিত শিষ্য—কাজী নজরুল ইসলাম।"

অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন বাঙলা তথা ভারতের বিপ্লববাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। বিপ্লবে বিশ্বাসী নজরুল নিজেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের "স্নেহ মহিমান্বিত শিষ্য" বলে উল্লেখ করে তাঁকেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা উৎসর্গ করেন।

অগ্নিবীণার প্রকাশকাল ১৯২২ সাল হলেও উৎসর্গের কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। মুজফফর আহমেদ 'কাজী নজরুল স্মৃতিকথা' গ্রন্থে এর পটভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। "তখন আমরা নবযুগ কাগজ বার করছি, আর থাকছি

৮/এ টার্নার স্ট্রীটে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরা থাকতেন শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রীটে। তাঁদের সাপ্তাহিক 'বিজলী'ও প্রকাশিত হত ওই ঠিকানা হতেই। শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসের (তখনও দেশবন্ধু হননি) মাসিক কাগজ 'নর নারায়ণ' পরিচালনার ভারও ছিল শ্রী বারীন ঘোষদের হাতে। নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁদের তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি। কিন্তু তাঁরা নজরুলের বাঁধনহারা হতে (তখন 'মোসলেম ভারতে' ছাপা হচ্ছিল) ছোট ছোট অংশ নারায়ণে তুলে দিয়ে তার ওপর ভালো মন্তব্য লিখতেন। "আদি পুরোহিত" ও "সাগ্নিক বীর" রূপে শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ওপরে নজরুলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তার ওপরে তাঁরা তাঁর লেখা সম্বন্ধে ভালো কথা বলছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য নজরুলের আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। সে তখন ছন্দে শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষকে একখানা ছোট্ট পত্র লেখে। ১৯২০ সালের এই ছন্দোবদ্ধ পত্রখানাই হচ্ছে ১৯২২ সালে মুদ্রিত 'অগ্নিবীণা'র উৎসর্গের গান।"

ভাঙা বাঙলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত,---
—সাগ্নিক বীর
শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ
শ্রীশ্রী চরণারবিন্দেষু

অগ্নি ঋষি! অগ্নিবীণা তোমায় শুধু সাজে
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে॥
দহন বনের গহনচারী
হায় ঋষি—কোন বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নি মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন বাঁশী সে বুঝতে পারি না যে॥
দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হান্‌ছিলে বৈশাখে
হঠাৎ সে কার শুন্‌লে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।
বজ্রে তোমার বাজল বাঁশী,
বহ্নি হল কান্না-হাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী
মন সরে না কাজে
তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্ত শিখা রাজে।

হুগলীর বিদুষী অগ্নিকন্যা, 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িত্রী মিসেস এম. রহমান সাহেবা নজরুলকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। মুসলমান কবির সঙ্গে হিন্দু বদ্যি মেয়ের বিবাহের বিষয়ে মিসেস রহমান সাহেবা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন কাজী প্রমীলা নজরুল (ওরফে আশালতা সেনগুপ্ত)

নজরুল মিসেস রহমানের নামে তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন কবি স্বয়ং। উৎসর্গপত্রে লেখা হয় বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা কুলগৌরব কবির জগজ্জননীস্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে গ্রন্থ উৎসর্গ করছেন (রহমান সাহেবার) নাগশিশু কাজী নজরুল ইসলাম। উৎসর্গ কবিতাটি নজরুল শেষ করেন এইভাবে ঃ—

"শুধু মাতা নহ জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি।"

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে 'বিষের বাঁশী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। বিষের বাঁশী গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রথম সংস্করণের কৈফিয়ত হিসাবে নজরুলের হাস্যরসাত্মক উক্তিটি স্মরণ করা যায়।

"অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যে সব কবিতা ও গান দেবো বলে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেইসব কবিতা ও গান দিয়ে এই বিষের বাঁশী প্রকাশ করলাম। নানা কারণে 'অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড' নাম বদলে বিষের বাঁশী নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইনরূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তার বাঁশ উচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ' রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশী লাগলে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা বাঁশী সুরের আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।"

বিষের বাঁশি গ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতা ঃ—

উৎসর্গ

বাঙলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-
গৌরবা আমার জগজ্জননীস্বরূপা মা
মিসেস এম. রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে

এমনি প্লাবন-দুন্দুভি-বাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস,—
সর্বনাশের ঝাণ্ডা দুলাহে বিদ্রোহ-রাঙা বাস
ছুটিতে আছিনু মাভৈঃ মন্ত্রী ঘোষি, অভয়ঙ্কর,
রণ বিপ্লব-রক্ত-অশ্ব কশাঘাত-জর্জর।
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল পথ-বাঁকে,
ওগো নাগ মাতা, বিষ-জর্জর তব গরজন ডাকে।
কোথা সে অন্ধ অতল-পাতাল-বন্ধ গুহার তলে
নির্জিত তব ফণা নিঙরানো গরলের ধারা গলে
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জালা ক্রন্দন-চুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ-চিক্কুর।
আঁধার-পীড়িত রোষ-দোদুল সে তব ফণা-ছায়া যেন!
হানিছে গৃহীরে অশুভ-শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ-কোল।
ধূমকেতু-ধ্বজ-বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়ায়িল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল।
ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নি শিশু ফণী
উল্লাসে 'জয় জয় নাগমাতা' হাকিল জয়ধ্বনি।
বন্দিল, উর নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল তল।
দুলিল গগনে অশুভ-অগ্নি-পতাকা জালা-উজল।
তারপর মাগো কোথা গেলে তুমি, আমি কোথা হ'নু হারা,
জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস-কারা।
শৃঙ্খলিতা সে জননীর ব্যথা বাজিয়া এ ক্ষীণ বুকে
অগ্নি হয়ে মা জ্বলেছিল খুন বিষ উঠেছিল মুখে,
শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে বাজপাখী সম
পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম,—
সে আক্রমণ ব্যর্থ কখন করেছে কারার ফাঁদ,
বন্দিনী দেশ-জননীর সাথে বেঁধেছে আমারে বাঁধ।
হাতে পায়ে কটি-গর্দানে মোর বাজে যত শৃঙ্খল,
অনাহারে তনু ক্ষুধা-বিশীর্ণ, তৃষায় মেলে না জল,
কত যুগ যেন এক অঞ্জলি পাইনিক আলো বায়ু
তারি মাঝে আসি রক্ষী-দানব বিদ্যুতে বেঁধে স্নায়ু

এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে
শত্রুর-হানা কণ্টক-ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে!
এরই মাঝে তুমি এলে নাগমাতা পাতাল-বন্ধ টুটি'
অচেতন মম ক্ষত তনু পড়ে তব ফণা তলে লুটে।
তোমার মমতা-মানিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্ব-জননী! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে।
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছ অভয় ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য মানিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে,—সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মানিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহ জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!

হুগলী
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১

তোমার নাগশিশু—
নজরুল ইসলাম।

নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। নজরুল এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'সুরসুন্দর শ্রী নলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু' কে। নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে কাজী নজরুলের প্রথম পরিচয় হয় 'বিজলী' পত্রিকার অফিসে। অল্পদিনের মধ্যেই এই পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। নলিনীকান্ত সরকারের মাধ্যমে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নজরুল গীতির প্রচারে নলিনীকান্ত সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। নজরুল বিবাহের পর কিছুদিন নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে বসবাস করেছিলেন। নজরুলের সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকারের সম্পর্ক কত মধুর ছিল তা জানা যায় পরিমল গোস্বামীর লেখা 'আমি যাঁদের দেখেছি' বই থেকে। নজরুল ইসলাম তার রুবাইয়াত-ই-হাফিজ গ্রন্থে নলিনীকান্ত সরকারকে 'আমার শ্রেয়তম আত্মীয়াধিক বন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন। পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রটি ঃ—

উৎসর্গ

সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
করকমলেষু

বন্ধু আমার। পরমাত্মীয়! দুঃখ সুখের সাথী!
তোমার মাঝারে প্রভাত লভিল আমার তিমির রাতি।
চাওয়ার অধিক পেয়েছি--বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জন,
বন্ধু পেয়েছি—পাইনি মানুষ, পাইনি দরাজ মন।
চারিদিক হতে বর্ষেছে শিরে অবিশ্বাসের গ্লানি,
হারায়েছি পথ—আঁধারে আসিয়া ধরিয়াছ তুমি পাণি।
চোখের জলের হয়েছ দোসর, নিয়েছ হাসির ভাগ,
আমার ধরায় করেছে স্বর্গ তব রাঙা অনুরাগ।
হাসির গঙ্গা বয়েছে তোমার অশ্রু তুষার গ'লি,
ফুলে ও ফসলে শ্যামল করেছে ব্যথার পাহাড়তলী।
আপনারে ছাড়া হাসায়েছ সবে হে কবি, হে সুন্দর!
হাসির ফেনায় শুনিয়াছি তব অশ্রুর মরমর।
তোমার হাসির কাশ কুসুমের পার্শ্বে বহে যে ধারা,
সেই অশ্রুর অঞ্জলি দিনু লহ এ বাঁধন-হারা।

কলকাতা নজরুল
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

কাজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র ঃ—

উৎসর্গ

আমার এই লেখাগুলি
বাহার ও নাহারকে দিলাম
কে তোমাদের ভালো?
"বাহার" আন গুলশানে গুল, "নাহার" আন আলো।
"বাহার" এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
"নাহার" এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

বাহার—বসন্ত। গুল্‌সান—ফুলবাগান। নাহার—দিন।

তোমরা দু'টি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী
একটি বোঁটায় ফুট্‌লি এসে,—নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি।

তামাকুমণ্ডি নজরুল ইসলাম
চট্টগ্রাম, ৩১-৭-২৬

নজরুলের প্রেমসংগীত গ্রন্থ 'বুলবুল' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। নজরুল এই গ্রন্থটি সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একটি কবিতায় উৎসর্গ করেন। নজরুলের প্রেমগীতিকে যাঁরা জনপ্রিয় করে তোলেন তাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় অন্যতম। নজরুলের গানকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টায় দিলীপকুমার রায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। উৎসর্গের কবিতায় নজরুল দিলীপকুমার রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন,

"যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তা'রে সব বুকে, সবখানে।"

'বুলবুল' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

সুর-শিল্পী, বন্ধু
দিলীপকুমার রায়
করকমলেষু

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তা'রে দিলে প্রাণ!
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি'!
আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ ল'য়ে,
আমার বেদনা বাজে তাই সবার বেদনা হ'য়ে।
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তা'রে সব বুকে, সবখানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশয় আমার নীড়ের পাখি,
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায়—কেন তা'রে বেঁধে রাখি?

তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুলবুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত তাহারে দস্তে লইও তুলি'!

কলিকাতা তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ
১৫ই আশ্বিন নজরুল
১৩৩৫

নজরুল তাঁর 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থটি, "বিরাট প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—শ্রীচরণারবিন্দেষু"-কে উৎসর্গ করেছেন। অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ঢাকায় নজরুলের অন্যতম সুহৃদ ছিলেন। উৎসর্গপত্রে নজরুল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অতুলনীয় ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
মনে হল এতদিনে দেখিনু দেবতা।"

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৯এ। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ কবিতাটির লেখার স্থান ও সময় কবি উল্লেখ করেননি। উৎসর্গপত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

বিরাট প্রাণ, কবি, দরদী—
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রী চরণারবিন্দেষু—

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ, কেন বারে বারে
মনে হল এতদিনে দেখিনু দেবতা।
চোখ পুরে এল জল, বুক পুরে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।

কোথা যেন দেখেছিনু কবে কোন লোকে,
সে স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।

চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি'
তুমি নিলে বক্ষে টানি, কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারীর ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহে—
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ-শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা পর।
নূতন করিয়া ভালোবাসিনু মানবে ;
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরি স্তবে
ভরিয়া উঠিল বুক, গাহি নব গান।
ভুলি নাই হে উদার, তব সেই দান।
উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে আবার নির্ব্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়ত জাগিবে মনে শুনি মোর গীতি।

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হতে আন-চরে, সেই গান গাই।

ভালোবেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান।

একটি অতি ছোট্ট কবিতার মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর হাস্যরস প্রধান 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থটি দাদাঠাকুর নামে সুপরিচিত "পরমশ্রদ্ধেয় শ্রী মদ্দাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরচচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে" উৎসর্গ করেছেন। এই তীক্ষ্ণ রসিকতাবোধ সম্পন্ন রঙ্গব্যঙ্গের কিংবদন্তি পুরুষ দাদাঠাকুরকে নজরুল 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন।

উৎসর্গ পত্রটি এ বকম ঃ—

পরমশ্রদ্ধেয়

শ্রীমদ্দাঠাকুর

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে—

হে হাসির অবতার!
লহ গো চরণে ভক্তিপ্রণত
কবির নমস্কার।

—নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামের 'বনগীতি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ। ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খান সেই সময়ে সঙ্গীতের জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর সঙ্গীতের শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কবিও জমীরউদ্দিন খান সাহেবের কাছে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। ওস্তাদের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য কবি তাঁর 'বনগীতি' কাব্যগ্রন্থটিকে 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে' উৎসর্গ করেন। মোবারক আরবি শব্দ, মানে শুভ। দস্ত ফারসি শব্দ, মানে হাত। 'বনগীতি' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ ঃ—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ
আমার গানের ওস্তাদ
'জমীরউদ্দিন খান" সাহেবের
দস্ত মোবারকে—

তুমি বাদশাহ গানের তখ্‌তে তখ্‌ত্ নশীন্,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজ্‌নু প্রেম রঙ্গীন!
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল-গীতি,
বিহগ-কাকলী, গন্ধর্ব্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত-উদার,
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখীর মত,
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা-রত।

বীণার বেদনা বেণুর আকুতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার, সুখী ব্যথায় ঝুরে।
সুর-শাজাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর "বনগীতি" নজরানা দিয়া দস্ত্ চুমি।

কলিকাতা —নজরুল ইসলাম

১লা আশ্বিন ,১৩৩৯

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতগ্রন্থ 'গুলবাগিচা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩এ। কবি এই গ্রন্থটি স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সত্ত্বাধিকারী "আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্ন হৃদয়েষু" কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রটি উদ্ধৃত করা হল—

("স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানী"র সত্ত্বাধিকারী)

আমার অন্তরতম বন্ধু

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

অভিন্নহৃদয়েষু--

বন্ধু! আমারে বাঁধিয়াছ তুমি অশেষ ঋণে,
দুঃসময়ের দুর্যোগ-রাতে দারুণ দিনে।
তোমার করুণা নির্ঝরিণীর স্রোতের সম
নামিয়া এসেছে রৌদ্র-দগ্ধ মরুতে মম।
কে জানে, কোথায় তুমি মোর সাথী বন্ধু ছিলে,
আত্মার-আত্মীয়রূপে তাই ধরা কি দিলে?
বিরাট তোমার প্রাণের ছায়ায় জুড়াতে পেয়ে,
ঘুমন্ত মোর গানের বিহগ উঠেছে গেয়ে
তেমনি করিয়া, গাহিত যেমন প্রথম প্রাতে—
দেবতার ছোঁওয়া পেয়েছি তোমার উষ্ণ হাতে ;-
তুমি যোগী, আমি বিয়োগ-বিধুর, আজ দু'জনে
যোগ বিয়োগের মিলন ঘটালে শুভক্ষণে।
বিত্ত তোমার রোধিতে পারেনি চিত্ত-গতি,
পর্ব্বত বাধা ভেঙে চলে যেন স্রোতস্বতী।
রৌপ্য হয়েছে রূপের কমল পরশে তব,
আড়াল করিতে পারেনি তোমারে তব বিভব।

গানের সওদা করিতে আসিয়া তোমার দেশে
ওগো অপরূপ সদাগর, প্রাণ দিয়াছি হেসে।
দিয়াছ অনেক, চাহনি কিছুই, করনি হিসাব,
বে-হিসাবী কথা কহি হর্দ্দম আমারো স্বভাব।
মিলিয়াছি ভালো বে-হিসাবী দুই বন্ধু মোরা
গীতালির দেশে মিতালী মোদের স্বপ্নে ভরা
দেবতার ঋণ শুধিতে কি পারে মানুষ কভু?
'গুলবাগিচার' পুষ্পাঞ্জলি দিলাম তবু।

কলিকাতা   সখ্যধন্য
ফাল্গুন, ১৩৩৯   নজরুল ইস্‌লাম

[বাজহংস (১৯৩৫), মানসসবোবব (১৯৪২), পঁচিশে বৈশাখ (১৯৪২), আত্মস্মৃতি (১৯৫৬), পান্থপাদপ (১৯৬০)]

সজনীকান্ত দাস ছিলেন ব্যতিক্রমী ব্যঙ্গ লেখক, সাহিত্যসমালোচব ও 'শনিবাবেব চিঠি' পত্রিকাব সম্পাদক। সাহিত্য সাধক চবিতমালাব কযেকটি জীবনচবিত তাঁব বচিত।

সজনীকান্ত 'বাজহংস' কাব্যগ্রন্থটি তাব মাতা তুঙ্গলতাদেবীকে একটি কবিতাব মাধ্যমে উৎসর্গ কবেন। তুঙ্গলতা দেবীব মৃত্যু হয ১৭ জুলাই, ১৯৩০ মাতাব মৃত্যুব পবে সজনীকান্তব বাজহংস কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয স্বাভাবিকভাবেই বাজহংস কাব্যগ্রন্থেব উৎসর্গেব কবিতায কবিব মাতৃহীনতাব বিষাদঘন আকুতি প্রকাশ পায।

বাজহংস কাব্যগ্রন্থেব উৎসর্গেব কবিতা ঃ

যে চপল নদী পাব হযে এল গিবি বন প্রান্তব,
কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকাবে,
থমকি দাঁড়াযে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিবে,
হিমালয-শিবে পেত কি দেখিতে কোথায উৎস তাব?
এপাবে ওপাবে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীব গূঢ়ব্যথা
বুঝিত কি নদী নদীজল কলকলে?
বুঝিত না, তবু স্রোতোজলে পেত উৎসেব পবিচয।

জননী, কঠোব মৃত্যু তোমাবে ঢেকেছে অন্ধকাবে,
হল সে অনেক দিন—
দেখিতে পাইনা দেহ-ক্ষয-কবা সেই করুণাব ধাবা
ওপাব হইতে এপাবে আমাবে তুমি এনেছিলে মাতা,
হারাইযা আজ গিযাছ আমার জ্ঞানবুদ্ধির পাবে,
বুঝিতেও নাহি পারি,

যে পথে চলেছি সেই পথে মোর ক্লান্তদিনের শেষে
রেখেছ কি পেতে স্নেহ-কোলখানি তব?
বুঝিতে পারিনা, তবু আছে আশ্বাস।

জননী আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধার আলোকে, আমার অতীতে বর্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোকে অন্ধকারে,
ব্যবধান মুখে তড়িৎ তীব্রজ্বালা
যেখানেই থাকো জননী, আবার সেতু কর নির্মাণ,
সহজ ব্যথায় আমারে প্রসব কব তুমি পরপারে।

জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা,
জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,
দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে, তুমি আছ কাছে কাছে ;
নিজে এসে মাতা, লহ মোর দীপারতি।

সজনীকান্ত 'মানস সরোবর' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি মোহিতলাল মজুমদারকে। বাদুড়বাগান লেনের মেসের সহবাসী হিসাবে মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয় হয় সজনীকান্তর। এই পরিচয়ই পরবর্তী সময়ে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে পরিণত হয়। সাহিত্যজীবনে সজনীকান্ত মোহিতলালের দ্বারা প্রভাবিত হন। 'আত্মস্মৃতি' ১ম খণ্ডে সজনীকান্ত অকপটে মোহিতলালের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। "তাহার সান্নিধ্যে আসিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম বলিয়া আমি সেই দুঃসময়েও ভাঙিয়া পড়ি নাই, এবং সাহিত্যকেই তরণী করিয়া দুস্তর জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিবার সাহস করিয়াছিলাম।" মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যকথা' গ্রন্থটি 'শ্রী সজনীকান্ত দাস'কে উৎসর্গ করেছেন। আদর্শ প্রত্যয়ের পার্থক্যের জন্য পরবর্তী জীবনে মোহিতলালের সঙ্গে সজনীকান্তর এই হৃদ্যতার সম্পর্ক ব্যহত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার কিছু পঙ্ক্তি সজনীকান্ত 'মানস সরোবর' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতা হিসাবে প্রকাশ করেছেন।

'মানস সরোবর' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র ঃ—

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার
শ্রীচরণকমলেষু

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি,—
'কে যাবে সাথে?'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে ;

দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জ্বলে।

মোহিতলাল ব্যতীত সজনীকান্তর সাহিত্যজীবনে আর যাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বভাব সমালোচক সজনীকান্ত তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে ঘোরতর রবীন্দ্র নিন্দুক ছিলেন। ১৯৩৮এ নিজ ধারণার পরিবর্তনের ফলে সজনীকান্ত রবীন্দ্র-নিষ্ঠ হন।

'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে সজনীকান্ত লিখেছেন—

"শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কবিতাটি আমার সাহিত্য জীবনকে প্রথম উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' ২য় সংস্করণের কবিতা নির্বাচনের কাজে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে অন্যতম সহকারীরূপে মনোনীত করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের গাত্রাবরণ, শিরস্ত্রাণ ও একখানি চিত্র প্রদান করে (১১ নভেম্বর, ১৯৩৯) সজনীকান্তকে সম্মানিত করেছেন। কবিগুরুর শেষ শয্যায় শেষের ক'দিন যাঁরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়েছেন সজনীকান্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গুরুদেবের প্রয়াণের পর একটি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে সজনীকান্ত তাঁর শোক প্রকাশ করেছেন। কবিতাটির নাম 'মর্ত্য হইতে বিদায়'।

সজনীকান্ত তাঁর রবীন্দ্র বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ 'পঁচিশে বৈশাখ' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতা :—

জীবনের মাঝে আনন্দ আছে বার্ত্তা পেয়েছি তোমার কাছে,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত আছে কি, সেই সন্ধান দিবে কি তুমি?

শয়ন-শিয়রে জাগিয়া আছি,
ঘুম ভেঙে তুমি ঘুমের দেশের খবর বলিবে তারি আশায়।'
হায় কল্পনা, দুরাশা হায়,
ছায়াপথ শুধু তারায় গঠিত, তারারা ধাতুর পিণ্ড সব।

আমরা মানুষ মোদের কপালে মরিবার সুখ এখনো আছে,
তুমি ম'রে গিয়ে অমর হয়েছ মরে ও অমরে নাই বাঁধন।
বৃথা কবিতার বুনি যে জাল
তোমার কাব্য পুঞ্জিত হয়ে পার হয়ে গেল তুহিন রেখা!
সেখানে বরফ গলে না হায়,
কার আঁখিজল হিমালয় হ'ল, কেহ কি পেয়েছে ঠিকানা তার?

মোদের হিসাব দিন আর মাস, বছরে বছরে পাকিছে চুল,
তোমার হিসাব মহাকাল এবে, পাকাচুল হয় কাঁচা আবার।
হায় কবি, নিলে চির-বিদায়,
একটি দিনের সমারোহে তাই আনে বিস্মৃতি চিরকালের।
চিরকাল—সে তো চলে না হায়,
যে ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে বলো তারে কে পকেটে নিয়ে বেড়ায়!

পঁচিশে বোশেখ, পঁচিশে বোশেখ, পঁচিশে বোশেখ—গানের নাম ;
গানকে বাঁধিতে পারে ততখানি দড়ি নাই হাতে মহাকালের।
গান যে আকাশে ভেসে বেড়ায়,
সুর হয়ে তুমি ধরার বাতাসে ছড়ায়ে গিয়েছ আপনাকেই।
প্রাণের আগুন নেবে যে হায়,
সুরের আগুন জ্বালে যেইজন মরণে তাহার কিসের ভয়!

৮ বৈশাখ, ১৩৪৯

উৎসর্গ পত্রের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডের (ডি. এম. লাইব্রেরী ৯ ভাদ্র ১৩৬৩) উৎসর্গ পত্রটি। এই গ্রন্থে লেখক উৎসর্গ বিষয়ক কোনো শব্দ ব্যবহার না করে কেবলমাত্র উৎসর্গিত ব্যক্তির মুখের স্কেচ ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন

কিন্তু উৎসর্গপত্রে তাঁর নামোল্লেখ ছিল না। পরবর্তী মুদ্রণে স্কেচটি বর্জিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রর নাম যুক্ত হয়।

কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 'শবিারের চিঠি'র সাহিত্য গোষ্ঠীর একজন অন্যতম সদস্য। 'দিবাকর শর্মা' ছদ্মনামে তাঁর অনেক সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রর 'মানময়ী গার্লস স্কুল' একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চ সফল নাটক। 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডের উৎসর্গের কবিতায় এই নাটকটির উল্লেখ আছে।

বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে ;
থার্ড ক্লাস সেই র'য়ে গেল থার্ড ক্লাস---
তবে কেন ছিঁড়ে চলে গেলে মায়াজাল?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী সুরে,
শেষ না হইতে, দিবা, তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাকো মানময়ী গার্ল-স্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে প'ড়ে—
দধিকর্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ।

সজনীকান্ত 'পান্থপাদপ' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবিবন্ধু শ্রী ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় অভিন্ন হৃদয়েষু'কে। সাহিত্যবন্ধু রামকমল সিংহের মাধ্যমে রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সজনীকান্তের পরিচয় এবং কালক্রমে এই পরিচয় অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বন্ধুত্বের নির্দশনস্বরূপ ধীরেন্দ্রনারায়ণ সজনীকান্তকে একটি রূপার গড়গড়া উপহার দিয়েছিলেন। 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডে সজনীকান্ত লিখেছেন, "উপযুক্ত নল লাগাইবার সামর্থ্য ছিল না, একটা সস্তা রবারের নল কোনরকমে সংগ্রহ করিয়া প্রহরে প্রহরে নিজেই তামাক সাজিয়া চক্ষু বুজিয়া টানিতে টানিতে আর্থিক গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার উপায় খুজিতাম।"

'পান্থপাদপ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র :—

উৎসর্গ—জন্মদিনে

কবিবন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় অভিন্নহৃদয়েষু—
তোমার আমার সূতিকা-ঘরের বহু দূর ব্যবধান।
কোথায় পদ্মা ভরাযৌবনা রূপসী কল্লোলিনী,
কোথা দামোদর রুক্ষ শীর্ণ রিক্ত সে যোগীবর,
প্রেম-বন্যায় দুই কূল-ভাঙা ক্ষণিক খ্যাপামি তার।
তুমি এসেছিলে রূপার চামচ মুখে,
কাঁসার ঝিনুক সলতের দুধে ছিল মোর সান্ত্বনা।
তুমি একা রাজা, আমি বেড়ে উঠি অবহেলা-অনাদরে
চাকুরে পিতার বহু-সন্তান-ভিড়ে।

হঠাৎ একদা হ'ল শুভখনে আমাদের পরিচয়,
দু'নদীর স্মৃতি বহে নিয়ে আসে দুই জলচর পাখী।
খর উত্তাপে তাপিত দগ্ধ সৌধ-শোভনা নগরীর রাজপথে,
যৌবন-রসে দুটি কণ্ঠেই কাব্য-কূজন ফোটে—
কোন্ অরণ্যে যেন জানাজানি পাতা-ছাওয়া কোনো নীড়ে।
নিদাঘ-দিনের জ্বালা-অবসাদ ধীরে কেটে গেল কাব্যে ছন্দে গানে ;
পড়ন্ত বেলা দুজনের ছাড়াছাড়ি।

বিস্মৃতিলীন গেল কতদিন দুজনেই উদাসীন,
নিজের বৃত্ত, নিজের পরিধি উভয়ে রচনা করি'
সুখ-দুঃখের নাগর-দোলায় কত দুলিলাম জানি না পরস্পর—
ভিন্ন চিন্তা বিভিন্ন পরিবেশ।
পুনঃ হল দেখা, মোদের তখন মলিন দিনের আলো,
আরক্ত-মেঘ-পশ্চিম-নভে কালো রেখা টেনে উড়িছে বকের সারি,
দূর অরণ্য-পর্বতসানু-নদী-বালুচর-সমুদ্র-সৈকতে
প্রবাসী পাখীর নীড়ে ফিরিবার সময় যখন হ'ল,
পুনঃ হ'ল দেখা গৃহ-প্রদীপের স্তিমিত-স্নিগ্ধালোকে,
বাহিরে তখন আঁধার নেমেছে নিখিল ভুবন ছেয়ে।

পুনঃ হ'ল শুরু কাব্য-কূজন নিভৃত ঘরের কোণে
দুজনই পাঠক, দুজনেই মোরা শ্রোতা।
মধ্যাহ্নের এক সুর হ'য়ে বহুধাছিন্ন অপরাহ্নের বিচিত্র পরিবেশে
দুটি হৃদয়ের আশা-আনন্দ-নিরাশা-দুঃখ-উৎসাহ-অবসাদে
দুইটি কণ্ঠে তোলে বহুতর রাগ-রাগিণীর সুর,
দুই কবি-প্রাণ সম-অভিভূত বেদনা ও উল্লাসে।
পদ্মা ও দামোদর
ভিন্ন প্রবাহ ভিন্ন তটের স্মৃতি-সুখ বুকে নিয়ে
মিলিত হইয়া ছুটে চলে এক সাগরের উদ্দেশে।

প্রদীপ-আলোকে শান্ত মধুর এ-মিলন-দিন স্মরি'
মোর জীবনের পিছে-ফেলে-আসা প্রেমতীর্থের সান্ধ্যপরিক্রমা
মানস-পরিক্রমা,
স্মৃতি-বিস্মৃতি হাসি-অশ্রুর ছন্দিত ইতিহাস
আমি যা রচিনু এনেছি তোমার কাছে,
প্রখর দিনের দাহ এতে নাই, নাহি তো রৌদ্রজ্বালা।
শিশির-স্নিগ্ধ অপরাহ্নের এ মোর ফসল, সুহৃদ, তোমার স্নেহে
হইবে ধন্য, লভিবে অনেক শব্দ-অতীত অপরূপ ব্যঞ্জনা।
তুমি কবি, প্রেম-ভাবের বন্যা বক্ষে তোমার এখনো তুফান তোলে,
ছন্দ-মিলের প্রচণ্ড স্রোতে কাব্য তোমার বহে আজো উদ্দাম।
অপরাহ্নের ভাঁটার টানেতে মোর খরস্রোত তটের শাসন মেনে
হয়েছে নিথর শীতল দীঘির কাকচক্ষুর জল।
ভালবেসে যদি তাকাও গভীরে, পাইবে দেখিতে ঘনমেঘ-সমারোহ,
ঘরভাঙা ঝড়, পাল-ছেঁড়া টাইফুন
পাইবে দেখিতে, তুমি তা দেখিবে জানি ;
তাই তো বন্ধু, আমি
হৈমন্তিক শস্য আমার তব রাজভাণ্ডারে
তুলিয়া দিলাম,তব করকমলেষু॥

জগদ্ধাত্রী-পূজাদিবস
১১ই কার্তিক, ১৩৬৭

[আঙিনার ফুল (১৯৩৪), বিচিত্ররূপিনী (১৯৩৭)]

অপবাজিতা দেবী রাধারানী দেবীর ছদ্মনাম। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে অপরাজিতা দেবী বাধাবানী দেবীব বিদ্রোহী সত্তা কিসেব এই বিদ্রোহ? প্রমথ চৌধুরী একবার বললেন, "মেয়েদের কোন নিজস্ব ভাষা নেই, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী নেই, তারা শুধু পুরুষের অনুকরণে লেখে।" প্রমথ চৌধুরীর কথায় অহং বোধে আঘাত লাগে বাধারানী দেবীর। অপরাজিতা দেবী—ছদ্মনামে কলম ধরলেন তিনি। ১৯৩০এ রাধারানী দেবী হলেন অপরাজিতা দেবী। প্রমাণ করলেন, মেয়েলি-ভাষা বলে ভাষা আছে, সে ভাষাতেও সুললিত ছন্দে অপূর্ব কাব্য রচনা করা যায়।

অপরাজিতা দেবীর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'আঙিনাব ফুল' ও 'বিচিত্ররূপিনী' উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবকে। 'আঙিনার ফুল' কাব্যগ্রন্থেব উৎসর্গপত্রে অপরজিতা দেবী ববীন্দ্রনাথকে একটি নতুন সম্পর্কেব অভিধায় 'কবি ঠাকুরদা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু' বলে সম্ভাষণ কবেছেন। 'বিচিত্ররূপিনী' কাব্যগ্রন্থটি অপরাজিতা দেবী উৎসর্গ করলেন। 'বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির উদ্দেশে'—। রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বাঁশীওয়ালা' কবিতা থেকে উৎসর্গ কবিতা রচনার প্রয়োজনে নির্বাচিত অংশবিশেষ উদ্ধৃতি করেই এই উৎসর্গের কবিতাটি রচিত।

উৎসর্গ পত্র ঃ আঙিনার ফুল

কবি ঠাকুরদা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

আমাদের গৃহ আঙিনাতে দাদু আপনি যে ফুল ফুটছে।
জীবন ফলকে প্রতিদিনকার সহজ যে ছবি উঠছে,
আমি নই কবি, সে ফুল সে ছবি পারিনি গুছিয়ে তুলতে!
তবু তাই নিয়ে করি ছেলেখেলা অবসর বেলা' ভুলতে!

তুমি এনে দেছো স্বপনপুরের সুন্দর সুর ছন্দ,
কল্পলোকের নব নব রূপ, মন্দার মধুগন্ধ।
আমি এনে দিনু তোমার চরণে অনাদৃত ফুলগুচ্ছ,
জানি বিদুরেব তণ্ডুলকণা নহে মাধবের তুচ্ছ!

—অপরাজিতা

'বিচিত্ররূপিনী' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্র ঃ

উৎসর্গ

বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির উদ্দেশে—

'ওগো বাঁশিওয়ালা,
আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে,—
রেখেছেন আধাআধি ক'রে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয়নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানিনে, ঠিক জায়গাটি কোথায়
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন ক'রে।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘর পোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী—
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।
ওগো বাঁশিওয়ালা,
সে থাক তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।'

—শ্যামলী

অপবাজিতা

'আঙিনার ফুল' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ বিষয়ে অপরাজিতা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্র প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে উদ্ধৃত করা হল।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বাংলাদেশে আমাকে গাল দিতে কেউ সঙ্কোচ করেনা আর আমাকে তোমার বই উৎসর্গ করতে এত সঙ্কোচ কেন? খুসি হব তাতে সন্দেহ কোরো না। তোমার লেখা অর্ঘ্য রূপে ব্যবহার করা চলে, তাকে অনাদর করব এতবড় গোঁয়ার আমি নই। বয়স হয়েছে কিন্তু অহঙ্কার জয় করতে পারিনি, আমার প্রতি কোনো ব্যবহারে তোমার যদি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় সেটাতে আমার মন প্রফুল্ল হবে, একথা তুমি ধরে নিতে পারো। সমাদর যতই পাই তৃপ্তির শেষ হয়না, এর থেকেই বুঝতে পারবে শেষ বয়সে ঋষি তপস্বী হয়ে ওঠবার কোনো আশঙ্কা নেই, কবি জনোচিত অকৃত্রিম দাম্ভিকতা নিয়েই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করব। অতএব বইটা উৎসর্গ করতে ভুলো না।

ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৪০ স্নেহাশীর্বাদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আঙিনার ফুল' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে অপরাজিতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে 'কবি ঠাকুরদা' বলে সম্ভাষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই সম্পর্ক আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। একবার রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়েছেন, পরে সুস্থ হয়েছেন, দুবর্লতা কেটে গিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে অপরাজিতা দেবী কবিকে একটি পত্র দিলেন, ৬ জুন, ১৯৩৮এ। ''দৈনিকী কাগজেতে পড়লাম বার্তা/ ছিল কবি দুর্বল, নন তিনি আর তা/ দুর্বল নন আর কবি? এ যে অপমান/ এ খবরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে কান।''....ইত্যাদি। অপরাজিতার চিঠি পেয়ে কবি রাধারানীর মাধ্যমে তার উত্তর দিলেন ১৬ জুন, ১৯৩৮। কবি লিখলেন, ''বে ঠিকানা তব আলাপ শব্দভেদী/ দিল এ বিজনে আমার মৌন ছেদি'/ দাদুর পদবী পেয়েছি, তাহার দায়/ কোনো ছুতো করে' কভুকি ঠেকানো যায়।''...ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সমসাময়িক সাহিত্য সমাজে অপরাজিতা দেবী কেবলমাত্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পরিচিত ছিলেন, ব্যক্তি অপরাজিতার পরিচয় কেউই পাননি। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপরাজিতা দেবীর মধ্যে বহু পত্র

বিনিময় হলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তি অপরাজিতার নাগাল পাননি। রাধারানী দেবীর মাধ্যমে উভয়ের পত্রের আদান প্রদান হত। রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরাজিতা দেবী ছিলেন রাধারানী দেবীর 'প্রিয় বান্ধবী'। কবি তাঁর জীবদ্দশায় অপরাজিতার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেননি। এ বিষয়ে রাধারানী দেবীর বিশেষ অনুশোচনাও ছিল। রাধারানী দেবী একটি পত্রে লেখেন, "আমার আত্ম-অঙ্গীকৃত গোপনতাব্রত উদ্‌যাপন কালের আগেই কবি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এই সাধনা আমার সার্থক হয়েও, বিষাদ ব্যর্থ হয়ে গেছে, কবির কাছে সমস্ত কাহিনী উন্মোচনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে।"

(সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে লেখা রাধারানী দেবীর পত্রের অংশ বিশেষ—পত্রের তারিখ ৭ বৈশাখ, ১৩৫৯)

[অমৃত (১৯১০), আনন্দময়ী (১৯১০), অভয়া (১৯১০)]

পেশায় আইনজীবী নেশায সাহিত্যসেবী রজনীকান্ত সেনেব ভক্তিসংগীত ও দেশপ্রেমমূলক গান বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ। বেশ কিছু হাসির গান ও ব্যঙ্গ কবিতাও বচনা করেন তিনি।

রজনীকান্ত তাঁব 'অমৃত' (নীতি কবিতা) গ্রন্থখানি একটি কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় কে। এই বইটি প্রকাশের চার মাস পরে দুরারোগ্য ক্যানসাব রোগে কবিব মৃত্যু হয়।

রজনীকান্তের অর্থকষ্টের সময যাঁবা তাঁকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দীঘাপতিযাব কুমাব শবৎকুমাব বায় উল্লেখযোগ্য। এই অর্থ সাহায্যের জন্য রজনীকান্তও শরৎকুমারেব প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। একটি পত্রে রজনীকান্ত লেখেন, "শরৎকুমাব সাতজন্মের সুহৃদ ছিল। শরৎকুমাবেব প্রাণটা আকাশের মতো। শরৎকুমাব এই চিকিৎসা চালিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে বেখেছে। শরৎকুমার সাহায্য না করলে আজ আমাকে দেখতে পেতে না।" কুমার শরৎকুমার রায়ও অকুণ্ঠচিত্তে এবং নির্দ্বিধায় রজনীকান্তকে অর্থ সাহায্য করেছেন। কবিকে লেখা একটি পত্রে শরৎকুমার লেখেন....."আমার নিকট আপনি প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জার বিষয় কিছুই নাই, কেননা আমি যে আপনাকে যৎকিঞ্চিত সাহায্য করিতে সুযোগ পাইতেছি, ইহা আমার বিশেষ গৌরবের বিষয় এবং ইহা আমি আমার কর্তব্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি।"

হাসপাতালে রচিত 'অমৃত' গ্রন্থটির উৎসর্গের কবিতায় কবি শরৎকুমারের প্রতি উদ্বেলিত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

নয়নের আগে মোর মৃত্যু বিভীষিকা ;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন, এ প্রাণ কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া? আর কেবা পারে?

কি দিব, কাঙ্গাল আমি? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্রমালা, বহুকষ্ট করি ;
ধর দীন উপহার ; এই মোর শেষ ;
কুমার! করুণানিবে! দেখো, র'ল দেশ।

কুমার শরৎকুমার রায়ের বিদুষী ভগিনী ইন্দুপ্রভা দেবীও রজনীকান্তকে বিশেষভাবে অর্থসাহায্য করেন। কৃতজ্ঞ কবি হাসপাতালে রচিত 'আনন্দময়ী' গ্রন্থটি ইন্দুপ্রভা দেবীকে উৎসর্গ করেন।

উৎসর্গ

সাহিত্যানুরাগিণী, 'বৈভ্রাজিকা' রচয়িত্রী,
বিদুষী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা চৌধুরানী মহোদয়া,
বিপন্নোদ্ধরণব্রতাসু—
দূর হ'তে স্নেহময়ী ভগিনীর মত,
কেঁদেছিল করুণায় ও কোমল প্রাণ,
তাই বুঝি সাধিবারে দুস্থহিত-ব্রত,
পাঠাইয়াছিলে, দেবী, করুণার দান!

মৃত্যুর কবল হ'তে নিয়েছিলে কাড়ি' ;
অযাচিত সহায়তা করিয়া প্রেরণ,
নতুবা যাইতে হ'ত, ধরাধাম ছাড়ি'
একাকী, অজানা দেশে, আঁধার ভীষণ।

ধন্য তুমি, ধন্য ভ্রাতা শরৎকুমার।
যাঁদের কৃপায় বেঁচে আছি এতদিন ;
ভুলিব না এ জীবনে করুণা তোমার
নিঃস্বার্থ, নীরব দান, ঘোষণা-বিহীন।

বিশীর্ণ, দুর্ব্বল হস্তে, কম্পিত অক্ষরে,
রচেছি "আনন্দময়ী,"—শুধু মার নাম ;

যে ক'রে করেছ দান, ধর সেই করে ;
ধন্য হই, সিদ্ধ হোক দীনমনস্কাম।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল — কৃতজ্ঞ
কটেজ ওয়ার্ড, কলিকাতা — গ্রন্থকার
আষাঢ় ১৩১৭ সাল

রজনীকান্ত 'অভয়া' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে। আর্থিক দানের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তৎকালীন অনেক সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্য সম্মিলন তাঁর আর্থিক বদান্যতায় পুষ্ট ছিল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কবিকে বহুবার হাসপাতালে সাক্ষাৎ করে গেছেন। কবির মৃত্যুর পর কবির পরিবারবর্গকে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করেন। কবির পুত্রদের পড়াইবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন মণীন্দ্রচন্দ্র। কবির 'অভয়া' গ্রন্থটির দু'হাজার কপি মুদ্রণের আর্থিক দায়ভার গ্রহণ কবেন তিনি। মহারাজার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য কবির মৃত্যুর পর বিনা সুদে তেরো হাজার টাকা ঋণ দান করে উত্তমর্ণদের কবল থেকে রজনীকান্তর যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা। কবি যথার্থভাবে 'অভয়া'র উৎসর্গ পত্রে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রকে 'দীন সজ্জনভরণেষু' বলে সম্ভাষণ করেছেন।

উৎসর্গ

সর্ব্ব বিভূতিমণ্ডিত অনারেবল্
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
দীন সজ্জন ভরণেষু—

হে প্রশান্ত-সুগম্ভীর-নিস্তরঙ্গ-করুণা-বারিধে।
দাঁড়াইয়া তোমার বেলায়,
এ দীন পূজক তব, স্পন্দহীন, নির্ব্বাক হইয়া,
চেয়ে থাকে, পূজা ভুলে যায়।
সহস্র প্রবল ঝঞ্ঝা, ব'য়ে গেল, গৌরবমণ্ডিত
শিরোপরে, স্থির হিমগিরি!
দীন উপাসক তব, দাঁড়াইয়া চরণ-প্রান্তরে
পূজা নিয়ে, আসিয়াছে ফিরি'।

আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপভ্রষ্ট দেবতার মত
　　আসিয়াছ কুটীর দুয়ারে ;—
শারীর-মানসশক্তি-বিবর্জ্জিত সেবক তোমার,
　　রুগ্ন,—আজি কি দিবে তোমারে?
যে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি,
　　তাতে দু'টি শুষ্কফুল আছে ;
দেবতা গো! অন্তর্যামী! একবার নিয়ো করে তুলি'
　　রেখে যাই চরণের কাছে।

মেডিকেল কলেজ হাপাতাল　　　　গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ
কলিকাতা　　　　গ্রন্থকার
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

সরিৎশেখর মজুমদার সাহিত্য জগতের বিশেষতঃ রঙ্গব্যঙ্গ কাব্যের আঙিনায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সাহিত্যের সব্যসাচী সরিৎশেখর বেশ কিছু সুন্দর ছোট গল্পের লেখক, কিছু ভালো উপন্যাসের স্রষ্টা, বহু প্রবন্ধের রচিয়তা। তাঁর অপূর্ব যাদু লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু সুন্দর কবিতা। কিশোর সাহিত্যও তাঁর লেখনী বঞ্চিত হয়নি। সরিৎশেখর মূলত রঙ্গব্যঙ্গের কবি। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'মুদ্গলমুনি' ছদ্মনামে।

সরিৎশেখর তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ 'রাংচিতার বেড়া' উৎসর্গ করেছেন সহধর্মিনী উমাকে। পেশাগতভাবে চাকুরীজীবি হলেও সাংসারিক জীবনে সাহিত্য-প্রাণ সরিৎশেখর ছিলেন একরকম পেয়িংগেস্ট। বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না, সংসারের ব্যয় সাশ্রয়কারিণী স্ত্রীর প্রতি সরিৎশেখরের ছিল অকুণ্ঠ মমত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতা। স্ত্রীর দূরদর্শিতার ফলেই রাংচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা জমিতে সরিৎশেখরের বর্তমান আবাসগৃহ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। 'রাংচিতার বেড়া' কাব্যগ্রন্থে উৎসর্গের কবিতায় কবি বলেছেন, "এ জমি আমিই যেন/আমাকে বেস্টন করে রাং চিতাদের/মধুর গৃহিণীপনা, বড় প্রয়োজন/" এ যেন জমির সঙ্গে একাত্মবোধ করে বাড়ির গৃহিণীর কাছে পরম নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ। প্রসঙ্গত, সরিৎশেখরের একটি লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি আরো পরিস্ফুট হবে।

"১৯৪৪এ বিবাহ। তখন একটা সুযোগ এল নিজেকে কবি সাহিত্যিক হিসাবে জাহির করার। পদ্য লিখে ফেললাম ভাবী বধূকে উদ্দেশ করে, রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠিয়েও দিলাম ঃ

ডাক শুনেছি উমার
তাই, থাকবো না আর কুমার।
আমি যেদিন আনতে যাবো তাকে
সেদিন তুমি এসোই এসো তেইশে বৈশাখে।

পাঠক এতে আমার সহধর্মিনীর নাম পেলেন, বিয়ের তারিখ পেলেন, কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুরালয়ের রক্ষণশীল পরিবারে কি তার প্রতিক্রিয়া হলো, তার

কোন খবর পেলেন না। তবে হ্যাঁ—বিয়েটা যে ভাঙেনি তাঁর সাক্ষী আমার সংসারে রয়েছেন একটানা ৫২ বছরের অধিক জ্বলজ্বলে সিঁদুর মাথায় নিয়ে। উমা হলেন সেকালের ডাকসাইটে ইংরাজী দৈনিক Indian Mirror এর সম্পাদক ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় মানুষ নরেন্দ্রনাথ সেনের নাতনী (অর্থাৎ আচার্য কেশব চন্দ্র সেনেরও)। আমি ঐ ভারতীয় দর্পণেই নিজের মুখ দেখে আসছি দীর্ঘকাল।"

('ফিরে দেখা'—সরিৎশেখর মজুমদার—'রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসিকেষু'—সরিৎশেখর মজুমদার সম্মাননা সংখ্যা-সৌজন্যে প্রাপ্ত)

উৎসর্গপত্র ঃ রাং চিতার বেড়া

উৎসর্গ

সহধর্মিনী উমাকে
ফালি জমিটাকে নিয়ে
মন কষাকষি আর কথা কাটাকাটি।

আমি চাইলাম,
টগর, গোলাপ আর ক্রিসিনথিমাম,
দু-রঙা বোগনভিলা, পর্টুলেখা দিয়ে
জমিটাকে তুলবো সাজিয়ে!
আর তুমি, ধরে আছো জিদ্ ;
রসনার তাগিদে এ-ভূমি
বেগুন পালংশাক দিক্।
ট্যাড়স, পেঁয়াজকলি, লিচু,
ধানিলঙ্কাও কিছু
রঙচঙা নোলকের মতো
ঝুলুক না ডালে ডালে।
জীবনটা টকে-ঝালে
কেটে যাক্ রন্ধনশালায়।
ভিন্ন মত, পৃথক সংহিতা।
পুঁতে দিয়ে চারা রাংচিতা
আমরা দু'জন তবু সীমানা চিহ্নিত করি
ফালি জমিটার।
একদিন কবি আবিষ্কার,

মাটির সংসার ঘিরে কি নিশ্চিন্ত এই পরিসীমা
এঁকে দিল রাংচিতা যত!
যৌবনভারাবনত দুধ-উথল দেহ
কি লাবণ্যমাখা।
মাথায় লালের ছোপ, সাবিত্রীর সিঁথি!

এ-জমি আমিই যেন।
আমাকে বেষ্টন করে রাংচিতাদের
মধুর গৃহিনীপণা, বড় প্রয়োজন।

—সরিৎশেখর মজুমদার

সরিৎশেখর তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'ভালোবাসা শ্বেত শঙ্খচিল' উৎসর্গ করেছিলেন 'ঋষি রবীন্দ্রনাথকে'। রবীন্দ্রনাথের কাছে সরিৎশেখর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, নিজেকে সমর্পণ করেছেন ঋষি রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গের কবিতায় কবি প্রার্থনা করলেন,

"এনেছো হে ভগীরথ আমার প্রত্যন্ত দেশে/অত্যন্ত আপন সেই রসধারাটিকে/...স্পন্দিত আমার প্রাণ/হোক তব হবনের হবি।" 'ভালোবাসা শ্বেত শঙ্খচিল' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে ঋষি রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতাটির মধ্য দিয়ে কাব্যগ্রন্থটির যে ভূমিকা রচিত হয়েছে তারই অভিব্যাপ্তি ঘটেছে এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় 'জীবন ও ভালোবাসা'য়।

উৎসর্গপত্র ঃ ভালোবাসা শ্বেত শঙ্খচিল

ঋষি রবীন্দ্রনাথকে

বিয়ৎ ও বসুধায় একদিন আধারস্থ হয়ে
হিরণ্যগর্ভ প্রাণ নিজেই যে অধীশ্বর
ইন্দ্রিয়ের অগোচর
সেই সত্য উদ্ভাসিত তোমারই মানসে।
স্বপ্নভঙ্গ নির্ঝরের
সংবিৎ-স্পন্দিত সেই প্রাণধর্ম
তুমিই জেনেছো
এনেছো হে ভগীরথ আমার প্রত্যন্ত দেশে
অত্যন্ত আপন সেই রসধারাটিকে।
তুমি ঋষি, সত্যদ্রষ্টা কবি।
স্পন্দিত আমার প্রাণ
হোক তব হবনের হবি!

[রোমান্স]

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রোমান্স' গল্পগ্রন্থটি পাঁচটি পর্বে (বৃক্ষারোহন পর্ব, কাঁঠালপর্ব, গুম্ফপর্ব, নৈশপর্ব, অশ্বারোহণ পর্ব) বিভক্ত। এই গল্পগ্রন্থটিতে প্রেমের বিচিত্রতার কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। লেখক এই গ্রন্থটি 'নবেন্দু ঘোষ বন্ধুবরেষু'কে কবিতার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন। দেশভাগ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় উৎসর্গের কবিতাটি লেখা। তবু এরই মধ্যে সুদিনের আলো দেখেছেন লেখক। উৎসর্গের কবিতায় লেখক লিখেছেন ঃ—

"তবু মনে করো কোনো শরতের রাতে
হঠাৎ কখনো মেঘের আড়ালে খেয়ালী চাঁদের হাসি,
আকাশে কখনো ওড়ে বুনো হাঁস মানস তীর্থচারী,
কাঁটাবন হতে একটি ফুলের ক্ষণিক গন্ধ আসে।"

ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার কুশলী নবেন্দু ঘোষ চিত্র নাট্যকার হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষ তাঁর 'কালোরক্ত' ১ম খণ্ড উপন্যাসটি "শক্তিমান কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু'কে উৎসর্গ করেন। এই বইটির প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৬৩।

উৎসর্গপত্র ঃ রোমান্স

উৎসর্গ

নবেন্দু ঘোষ
বন্ধুবরেষু

স্বাধীনতা এল, আকাশে জেগেছে নবজাতকের দিন,
ধন্য হল কি রক্তের অভিসার?
তোমার আমার জীবনের 'পরে গুরুভার দুঃসহ
কাঁটাবন আর শঙ্খচূড়ের ফণা,
কিউ, কণ্ট্রোল, কালোবাজারের অযুত অক্টোপাস,

এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা—ভারত—পাকিস্তান,
মাঝখানে বালুচর
আমাদের বালুচর,
যূথীবন নেই, বিকচ কেতকী কোথা,
ভাগাড়ের হাড়ে হাতছানি দেয় প্রেত পঞ্চাশ সাল,
এল কি বন্ধু, নবজাতকের দিন?

গুরু গুরু মেঘ কোথা ধমকায় কালবৈশাখী আসে,
ক্ষাত্র বিনাশ কোটি কোটি মুঠি মৌর্বী-কিণাঙ্কিত
তেলীঙ্গানায়, গোল্ডেন্ রকে, তে-ভাগার মাঠে মাঠে
কতদূরে স্বাধীনতা?
মরা বালুচরে, ভাগাড়ের হাড়ে আমরা স্বপ্নাতুর ঃ
তুমি আর আমি স্বাধীন মানুষ, আকাশে তুলেছি মাথা

আজো পথে পথে ফণিমনসার শঙ্খচূড়ের ফণা—
আশা নেই—নেই আলো?
ওই তো মেদিনীপুর।
পাঁজরে পাঁজরে হোমাগ্নি জ্বলে, স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়,
বুকের ভেতরে জ্বেলেছি মশাল—সমুখে ত্রিবাঙ্কুর।
তবু মনে কোরো কোনো শরতের রাতে,
হঠাৎ কখনো মেঘের আড়ালে খেয়ালী চাঁদের হাসি,
আকাশে কখনো ওড়ে বুনো হাঁস্ মানস তীর্থচারী,
কাঁটাবন হতে একটি ফুলের ক্ষণিক গন্ধ আসে।

যে জীবন ছিল প্রথম প্রভাতে—যে জীবন বহুদূরে,
তার খেয়ালের অকারণ খুশি যদি দুলে ওঠে বুকে,
কতটুকু তাতে ক্ষতি

নাচে ঝড়ো হাওয়া—আকাশে বজ্র হাঁকে,
সেই তো সত্য, সেই তো পথের সাথী।

তবু তো বন্ধু কোনো শিবিরের উচ্ছল অবকাশে
হালকা কথার মালা গেঁথে যদি বলি কারো কানে কানে,
নয় সে সত্য—তবু কি সত্য নয়?
ওদিকে ঝড়ের স্তব্ধ ইসারা—এদিকে চক্রবালে,
অস্তরবির রঙমাখা মেঘে তবু তো দেখছ হাসি।
'এই সীমান্তে' চলেছ বন্ধু 'কালো রক্তের' পথে,
পারো যদি নিয়ো লঘু খুশিটুকু শিবিরের অবকাশে।"

প্রীতিমুগ্ধ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আরও কিছু উৎসর্গের কবিতা
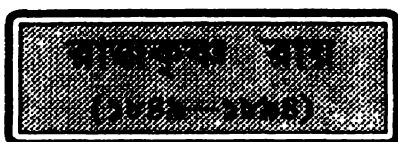
গ্রন্থের নাম : নিশীথ চিন্তা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১২৮৪

উপহার

বঙ্গসাহিত্যে প্রভাত নক্ষত্র
কোবিদচূড় কবিবর
শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ
'বান্ধব' সম্পাদক মহাশয়।

প্রিয়তম সুহৃদ,

যে করে 'প্রভাত চিন্তা' করিলে সৃজন,
সে করে 'নিশীথ চিন্তা' করিনু অর্পণ।

১লা আশ্বিন
১২৮৪

প্রীতিমুগ্ধ
রাজকৃষ্ণ
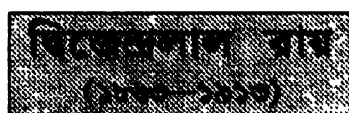
আর্যগাথা (১ম ভাগ)—১৮৮২

উপহার

সহোদরে!

চাহিতে যে সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত কুসুমে
গুটিকত ফুল তুলি চিত্তবন-ভূমে,
রচিয়া এনেছি হার, শোভা নাহি থাকে তার,
ধর কণ্ঠে শোভা পাবে—আনিয়াছি যতনে,
কি তোমার কণ্ঠ'পরে, পূর্ণশোভা নাহি ধরে,
কি নাহি কোকিলস্বরে, ঢালে সুধা শ্রবণে,
কি বা নাহি ধরে শোভা পূর্ণবিধু কিরণে।
গাছ হতে ফুলগণে যদিও এনেছি তুলি,
আমার নয়ননীরে বেঁচে আছে ফুলগুলি,
ভগিনি! অন্তিমে যবে, শেষ অশ্রু শুষ্ক হবে,
না পেয়ে নয়নবারি, নিমীলিত হবে হার ;
তখন কি ফুলদলে, দিবে বিন্দু আঁখিজলে?
জাগিবে কুসুমগুলি পেয়ে তব অশ্রুধার।

সামান্য বলিয়ে হারে, ফেলিয়ে দিও না তারে,
কি দিব তোমারে ভগ্নি! কি আছে আমার ;
কি দিবে কিছুই নাই, দরিদ্র কাঙ্গাল ভাই,
অসীম স্নেহের এই তুচ্ছ উপহার,
ধর তায়—হৃদয়ের ভগিনি আমার।

দ্বিজেন্দ্র

আর্যগাথা (২য় ভাগ) ১৮৮৩।

উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুধু উজলিতে ; স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে ;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি ?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু ;—সে কি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী"-বয়ানে?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আস নি আজি সে বেশ পরি ,
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়।
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন— অতীব সুন্দর মুখখানি ;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,—
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজি যৌবন সোদ্যম ;
প্রভাত-শিশির
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাস সম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের মত ;—
সে দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত।

৫

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল ;
ছিলে বা তখন
প্রাতঃস্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল ;

ছিলে নক্ষত্রের সম অৰ্দ্ধ রজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির ;—
কিন্তু দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, ‘প্রেমে’ আস নাই।

৬

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশ নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত ;
হইত আশ্চর্য্য তাহা।
কিন্তু হইত না অৰ্দ্ধমধুরসংগীত ও
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহময় ‘প্রেম’।

গ্রন্থের নাম ঃ ফুলশয্যা

প্রথম প্রকাশ ১৮৯৪

উপহার

এই পুস্তক গয়ার জমিদার
শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্রের
করকমলে সাদরে অর্পিত হইল।

মহাত্মন!

সময় বহিয়া যায় শুদ্ধ তব করুণায়,
সময় পড়িয়াছিল ধরা ;
ডুবিতে অতল জলে, শুদ্ধ তব কৃপাবলে
আবার দেখিয়াছিনু ধরা।
বসিতে পাইলে লোক শুতে করে আশা,
করুণা ভিখারি শেষে চায় ভালোবাসা।

গ্রন্থাকার।

গ্রন্থের নাম ঃ গল্পসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতি

২০ ভাদ্র ১৩৪৮ (১৯৪১)

উৎসর্গ

কালীপ্রসাদ চৌধুরী

জন্ম	মৃত্যু
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫	১৭ই জুন ১৯৪১
	বিমানযুদ্ধে নিহত

তোমার বয়স যখন আড়াই বৎসর, তখন
তোমার নমে এই triolet টি লিখি—

ছোট কালীবাবু

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়স তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যাবে, সেজে ফুলবাবু ;
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু,
সুরে গায়, তালে নাচে, হাসে চরাচর।
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু
যদিচ বয়স তার আড়াই বছর॥

১৬ই জুন ১৯১৮

আর আজ?—

"স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম। তথাপি কিং করোমি।
স্বভাবস্য বেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং
পুত্র শোকহতভুজো জাতোহস্মি।"

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১

তোমার-ন-কাকা
প্রমথ চৌধুরী
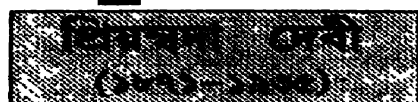
রেণু (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ ১৯০০

উৎসর্গ

বৈকুণ্ঠে দেবের বাস, স্মরিয়া তাহারে
ভক্ত দিয়ে যায় পূজা এই পৃথ্বীপরে ;
গঙ্গাতীরে, তীর্থস্থানে, মন্দির দুয়ারে,
আনন্দে পূরিত প্রাণ, নমি ভক্তিভরে।

পায় না তাঁহার দেখা, জানে নাক হায়
সার্থক হ'ল না হ'ল সে পূজা তাহার,
তবু লয়ে আসে পূজা, তবু তৃপ্তি পায়
উদ্দেশে চরণ বন্দি পূজ্য দেবতার।

তুমি আজ বহুদূরে, দুলর্ভ দর্শন।
তবু তুমি একমাত্র উপাস্য আমার
এই স্নেহ এই প্রীতি, ধেয়ান ধারণ
এই গীতগুলি মোর সেই উপহার।

অংশু (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ ১৯২৭

উৎসর্গ

কত শুক্লা অমা, কত তারকার পাঁতি,
কত না গোধূলি, কত স্তব্ধ দিবা রাতি,
নিঃসম্বল বিজন একেলা,
যার লাগি কিরণের মেলা,
আমার মনের দেখা,
আঁখির আলোক লেখা,
দিনু তারে, যে আমার মানসের সাথী।

[১৮৯২ খ্রীঃ মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত উকিল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর সঙ্গে প্রিয়ম্বদা দেবীর বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যর পরে 'অংশু' এবং 'রেণু' কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। অনুল্লেখিত হলেও দুটি কাব্যগ্রন্থই যে তার প্রয়াত স্বামীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এ ধারণা করা যায়।]
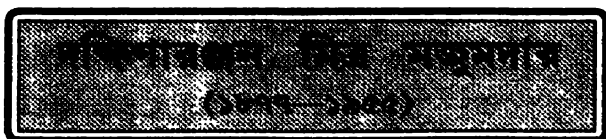
গ্রন্থের নাম ঃ ঠাকুরমা'র ঝুলি

প্রথম সংস্করণ-১৩১৪ ভাদ্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

উৎসর্গ

নীল আকাশে সূর্য্যিমামা ঝলক দিয়েছে,
সবুজ মাঠে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে,
পালিয়ে ছিল সোনার টিয়ে ফিরে এসেছে,
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন হাসতে লেগেছে।
হাসতে লেগেছে রে খোকন্ নাচ্‌তে লেগেছে.
মায়ের কোলে চাঁদের হাট ভেঙ্গে পড়েছে।
লাল টুক টুক সোনার হাতে কে নিয়েছে তুলি'
ছেড়া নাতা পুরোন কাঁথার—

ঠাকুরমা'র ঝুলি

—বাঙলা-মা'র বুক-জোড়া ধন—
এত কি ছিল ব্যাকুল মন।
—ওগো—
ঠাকুরমা'র বুকের মানিক, আদরের 'খোকা খুকি'।
চাঁদমুখে হেসে নেচে নেচে এসে, ঝুলির মাঝে দে উঁকি।
ওগো-।
সুশীল, সুবোধ, চারু হারু বিনু লীলা শশি সুকুমারি।
দ্যাখ তোরে এসে খোঁচা খুঁচি দিয়ে ঝুলিটারে
নাড়ি' চাড়ি'।
—ওগো—
বড় বৌ ছোট বৌ। আবার এসেছে ফিরে'
সেকালের সেই রূপকথাগুলো তোমারি আঁচল ঘিরে'।

ফুলে ফুলে বয় হাওয়া, ঘুমে ঘুমে চোখ ঢুলে,
কাজগুলো সব লুটুপুটি খায় আপন কথার ভুলে।
এমন সময় খুঁটে লুটে' এনে হাজার যুগের ধূলি
চাঁদের হাটের মাঝখানে'—মা!—ধুপুস করা—
ঝুলি!!

হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে!
হাঁউ মাঁউ কাঁউ শব্দ শুনি রাক্ষসেরি পুর—
না জানি সে কোন্ দেশে না জানি কোন্ দূর!
নতুন বৌ! হাঁড়ি ঢাক' ; শিয়াল পণ্ডিত ডাকে,—
হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা কোন্ রানীদের পাপে?

তোমাদেরি হারাধন তোমাদেরি ঝুলি
আবার এনে ঝেড়ে' দিলাম সোনার হাতে তুলি'।
ছেলে নিয়ে মেয়ে নিয়ে কাজে কাজে এলা—
সোনার শুকের সঙ্গে কথা দুপুর সন্ধ্যাবেলা,
দুপুর সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মি! ঘুম যে আসে ভুলি'।
ঘুম ঘুম ঘুম,
সুবাস কুম্ কুম্—
ঘুমের রাজ্যে ছড়িয়ে দিও
ঠাকুরমা'র
এ

গাছের আগায় চিক্‌মিক্
আমার খোকন হাসে ফিক্-ফিক্!
নীলাম্বরীখান গায়ে দিয়ে, খোকার—মাসী এসেছে।
নদীর জলে খোকার হাসি ঢেলে' পড়েছে।

আয়রে আমার কাজলা বুধি, আয় রে আমার হুম্মে,—
গাছের আড়ে থামলো রে চাঁদ, আমার সোনার মুখে চুমো।

ঘরে ঘরে লক্ষ্মীমণির পিদিম জ্বলেছে,
দেবতার দুয়ারে কাঁসর বেজে' উঠেছে—
নাচবে খোকা, নিবে প্রসাদ খোকন আমার গঙ্গাপ্রসাদ—
কোন স্বর্গের ছবি খোকন্ মর্ত্যে এনেছে?

ও খোকন, খোকন রে।
আর নেচো না, আর নেচো না নাচন ভেঙ্গে পড়েছে!—
দেখ্‌সে' আঙ্গিনায় তোর কে এসেছে।
আঙ্গিনেয় এলো চাঁদের মা দেখ্‌সে' খোকন দেখে যা,
ঝুলির ভেতর চাঁদের নাচন্ ভরে' এনেছে।
ঝুলির মুখ খোলা,—খোকার হাসি তোলা—তোলা—
ঠাকুরমা'র কোলটি জুড়ে কে রে বসেছে?

গ্রন্থের নাম ঃ **বিনোদিনী**
(১৯২৭)

উৎসর্গপত্র

মলয়,

তুমি,

ফুল হ'য়ে ফোটোনাক আমার অঙ্গনে-
অস্ফুট কলিটি, পরে প্রপূর্ণ যৌবনে
ঢল ঢল মুখে—
হাসিয়া হাসিয়া তুমি নাচিয়া দুলিয়া
হৃদয়ের মধুকোষ দাও না খুলিয়া
আমার সম্মুখে।—

আমার এ আম্রশাখে জাগিলে মঞ্জরী
আকুল হইয়া তুমি আস না গুঞ্জরী
মধুপ সমান ;
তোমার গুঞ্জন গান মুকুলের গায়ে
রাখেনা আনন্দঘন রোমাঞ্চ জাগায়ে
সারা দিনমান।—
শুনিতে শুনিতে বেদ-বন্দনার গান
তপনের মত তব হয় না উত্থান
পৃথিবী উজলি,
নয়নে আলোক দিয়ে হৃদয়ে চেতনা
জীবন প্রবাহমূলে তুমি ত' ঢালো না
উষ্ণ রসাঞ্জলি।—
বৈশাখের অপরাহ্ণে খররৌদ্র পরে
আস না ঈশানে তুমি সাজি স্তরে স্তরে

মেঘের মতন—
ঢালো না গর্জ্জন করি দীর্ঘ জলধার
ধরার তাপিত অঙ্গে, তুলি অঙ্গে তার
শ্যাম আস্তরণ।

নাহি শব্দ, নাহি রূপ, নাহিক কিরণ-
শুধু স্পর্শ, যেন কার নিশ্বাস পতন,
গোপনচারিণি ;—
আস তুমি গোপন পথশ্রান্ত দেহ—
যেন কার অনাহত সুগভীর স্নেহ—
চিনিতে পারিনি।

গ্রন্থের নাম ঃ ছোট্ট ছোট্ট গল্প

ইন্দ্রনীল ও তিমা-কে

ছোট্ট দাদা 'ইন্দ্রনীল' মানিক জ্বলে উজল চোখে যার,
হাসিখুসি 'তিমা' রাণি মিষ্টি মধুর ছোট্ট বোনটি তার,
খেলাধুলা নাচে গানে ছোট্ট প্রাণের খুসির আলো ঝরে
ঘরটি আলো করে আছ, আরও অনেক আছ কত ঘরে।
ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, শুনবে যারা, পড়বে অল্পস্বল্প,
তোমাদেরি ছোট্ট হাতে দিলাম আমার ছোট্ট ছোট্ট গল্প,
পেয়ে যদি খুসি হও, চাঁদ মুখেতে ফোটে মধুর হাসি
তা' হলেই সুখী হব—সেই তো আমি দেখতে ভালবাসি।

গ্রন্থের নাম ঃ— **ছেলেবেলার দিনগুলি**

উৎসর্গ

রুণু সোনা
তোতোমণি জোজোমণি বাবু সোনা

"গল্প বল দিদা।" বলে কাছে যখন আস,
শুধাই যদি "কোন গল্প শুনতে ভালবাস?"
"তোমার ছেলেবেলার গল্প শুনতে মোরা চাই।'
এই কথাটা বারে বারেই তোমরা বল ভাই।
কবেকার সে কথা রে ভাই—আমার ছেলেবেলা!
কতদিনের হাসি খেলা আনন্দেরি মেলা,
কত কালের পুরানো সে নানারঙের ছবি,
মনের মাঝে উজল হয়ে ফুটে ওঠে সবি ;
কত প্রিয় হারানো মুখ চোখের 'পরে রাজে ;
সে সব মুখের বাণী যেন আজও কানে বাজে ;
মধুর স্মৃতি জড়ানো সেই সোনার দিনগুলি
মালা গেঁথে তোমাদেরি হাতে দিলাম তুলি।

—দিদা
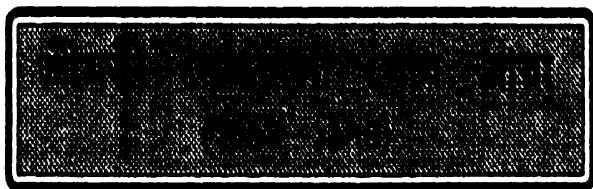
গ্রন্থের নাম ঃ— আড়াই চাল

প্রথম প্রকাশ ঃ—১৩২৬

উৎসর্গ পত্র

নমো নারায়ণায়

উৎসর্গ

"পরিচারিকা" সম্পাদিকা
মাননীয়া কবি, রানী নিরুপমা দেবী
সুহৃদ্বর শ্রী করকমলেষু

'পূজার ফুলের মত' হে শুদ্ধ, হে সুচরিত
কবিত্ব-সুষমা পূর্ণ, হে মহৎ প্রাণ,—
পূজার্হ সে 'বন্ধু-স্মৃতি", মনোরম বন্ধু প্রীতি
উদ্দেশে উৎসর্গি,—বন্ধু প্রাণের সম্মান।

ইতি—
বিনয়াবনত 'বন্ধু'
শৈলবালা।

আরাবল্লীর কাহিনী
অশোকা গুপ্তা ও
অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
১৩৭২ (১৯৬৫)

উৎসর্গ

রাজশেখর বসু মহাশয়ের স্মরণে—

সে কবে হেরিনু মুগ্ধ অন্তঃপুর হতে
গড্ডলিকা একদল সাহিত্যের পথে
নামিয়াছে। অনামিক যাদুকর তার
কণ্ঠরজ্জু ধরে চলে, অচেনা সবার।
পথে আর কেহ নাই পথিক একক
চাহিল বিস্ময় মুগ্ধ সহস্র পাঠক।
কে জানিত জ্ঞানযোগী বিজ্ঞানী নীরব
কৌতুক পরশু হাতে নিয়ে অভিনব
চলেন গোপনে। সাথে ভারত পুরাণ
অপরূপ সমাবেশ,—এনেছিল দান,
বিচিত্র সাধনা নিয়ে নিঃসঙ্গ সাধক।
নির্লিপ্ত নয়নে যেন জগৎ দর্শক।

কোথা গৃহকোণে এক লেখা খেলাঘর
রচে কোন নারী, তার কে রাখে খবর।
শুধাইলে অযাচিতে পরিচয় নাম।
আজ আনিয়াছি তার কৃতজ্ঞ প্রণাম।

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৭২

গ্রন্থের নাম : সোনা রূপা নয়
জ্যোতির্ময়ী দেবী
রূপা এণ্ড কোম্পানী
মহালয়া, আশ্বিন ১৩৭৬
প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ
আষাঢ়-১৩৮০

উৎসর্গ

"সোনা নয় রূপা নয়—ঐশ্বর্য সম্পদ—
ধনজন—গৃহ যশ-খ্যাতি-মান-পদ—
কিছু নয়, কিছু নাই। ছোট বড কুচি
কাগজ এ শুধু। শুধু লিখি ছিঁড়ি মুছি
সাগর বুদ্বুদ সম ঢেউ ভেঙে উঠি
হৃদয় বেলায় তারা করে লুটোপুটি।
তার মাঝে ফিরে মন কি কথার খোঁজে
লিখিয়া লইতে চায় কালিতে কাগজে।
কোথা সে কাগজ হায় কোথা বা সে কালি
সে কালির রঙ যেন সোনালি রূপালি
ক্ষুদ্র খণ্ড কাগজের মহাকাশে মোর
ফুটাবে তপন চাঁদ তারার অক্ষর।
যদি লেখে দু'একটি সোনার লিপিকা
জীবনের সত্য মিথ্যা মায়া মরীচিকা।
০ ০ ০ ০ ০
হায় এ যে ইন্দ্রধনু চাঁদ তারা নয়
নিমেষে মিলায় রঙ লীলা পরিচয়
সেই রঙে ডুবালাম আমার রঞ্জিকা
শূন্যে শূন্যে আঁকা মোর এরা নিমেষিকা।
০ ০ ০ ০ ০
অশোকা, অনুভা, অঞ্জলি, সুহাসিনী, অনিমা
ও অণিমা রায়কে দিলাম।"

ধূপ

'ধূপ' কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৩২৫ সালে। উৎসর্গের কবিতায় 'উৎসর্গ' বিষয়ক কোন শব্দনেই। উৎসর্গকারীর নাম, উৎসর্গীকৃত ব্যক্তির নাম বা পরিচয় এবং উৎসর্গের তারিখ উৎসর্গের কবিতায় অনুপস্থিত।

পূজা মন্দির মাঝে
পূজা আয়োজন করিয়াছি শুধু
সঙ্কোচে ভয়ে লাজে।
চয়ন করেছি কুসুম কলিকা
গোপন সুরভি ঢালা,
তব কণ্ঠের মতন করিয়া
গাঁথিয়াছি বরমালা।

আছে কি তাহাতে মধু?
দীন ভাণ্ডার করিয়া উজাড়
তুমি কি লবেনা বঁধু?
বুঝে দেখো তুমি আছে কি না আছে
অমৃত কিবা সুধা,
নিমেষের লাগি মেটে কিনা মেটে
গোপন মনের ক্ষুধা।

তুমি যদি কর মন,
এক নিমেষেই সার্থক হয়—
মোর পূজা আয়োজন।
তুমি যদি কর গৌরব দান
কিছু নাহি চাহি আর,
পদতলে যদি টেনে নাও তুমি
সেবিকার সেবা ভার।

জান কি বিশ্বভূপ।
বাসনার মুখে দিয়েছি আগুন
জ্বালাতে তোমার ধূপ?
তোমার আসন তলায় আসিয়া
মনের কালিমা মুছি,
চিরকলঙ্কী অন্তর মোর
হয়েছে শুভ্র শুচি?

বুকে তুলে নিনু সেবা,
তব পূজা ভার নিয়েছে যে জন
তার মত সুখী কেবা?
কোথায় জীবন, কোথায় মরণ,
কোথায় তুচ্ছ প্রাণ,
চরণের কাছে তুলিয়া ধরেছি
ভক্তির ধূপদান।

গ্রন্থের নাম :— কবি-তীর্থের পাঁচালী

প্রথম প্রকাশ :— ১৩৫৩

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ

শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
মহাশয়ের করকমলে

সোনার তুলিতে মাখায়ে মনের রং
জগৎ রঙালো ঐ হাতখানি তব।
রঙের নেশায় বিভল পাগল তুমি,
মরমী মনের ছবি আঁকো নবনব।
আমার পুঁথিতে তোমার তুলির টান
পাতার কুটিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ-মত।
সার্থক হ'ল গ্রাম্য-পাঁচালী মোর,
পল্লীর কবি ধন্য হইল কত!

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৫২

বিনীত
শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

গ্রন্থের নাম গল্পের ভূত
প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স
১৯৮২

উপহার

শ্রীমান্ পাঁচুগোপাল রায়
কল্যাণীয়েষু

শরতে গ্রীষ্মে বাদলে ও শীতে লম্বা তক্তাপোষে,
চেয়ারেতে কেহ দুই পা তুলিয়া, জমাট হয়েছি ব'সে।
সন্ধ্যে বেলায় ভূতের গল্পে আসর উঠেছে মেতে।
ভাঙিল আসর দূরের যাত্রী ভয় পেত ঘর যেতে।
ঘোষালবাবুর দিদির দেখ্‌তা উইলবাড়ীর খাওয়া ;
কমলাক্ষের সাক্ষাৎ দেখা ইঞ্জিন ভূতে পাওয়া ;
কর্জন গেটে টয়্‌লেটে যেতে দাশগুপ্তের ছেলে
কি জানি কোন্ সে ভূত বা বাতাস জ্বলজ্বলে চোখ মেলে ;
বিপত্নীক সে হেড্‌মাস্টার কন্যার দুর্মতি
শুনিলে কাহার গলে না চিত্ত ভয় সত্ত্বেও অতি।
এসব কাহিনী গল্প তো নহে, সত্য ঘটনা বটে,
তুমি তাহা জান, আঁকা আছে সব তোমার চিত্তপটে।
সাহিত্যসভায় তুমি তো হাজির সাক্ষী অংশীদার,
তাই তো তোমায় এই বইখানি দিনু আমি উপহার॥

২৭.৮.৮২ শ্রী সুকুমার সেন

গ্রন্থের নাম : ঘরে ফেরার দিন
প্রকাশক : নাভানা
১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

সেই পুরাতন জ্যোতি—
কবি তাঁর জানান প্রণতি ॥
চেতনা উদয় অন্তহীন
—যস্তদ্বেদ স বেদ—
হৃদয়ে ধরেন সমাসীন ॥

প্রকাশিত সূর্য কোটি লোকে।
উদ্ভাসিত দেখেন আলোকে ॥
সকৃৎ, উপাস্য, দৈবজ্যোতি—
কবি তাঁর জানান প্রণতি ॥
প্রতিদিন জাগ্রত সংবিত,
দেখেন সংসারে ব্রহ্মবিদ ॥
করুণার সৃষ্টিকাজ শেষে
এ জন্মের পারে এসে
মৃত্যুলোক পার হন প্রাণে,
মৃত্যোরাত্মানং পরিহারনীতি—
জ্যোতির আহ্বানে
পৃথিবীতে তাঁর
ঐ কাব্যদীপ্তি ধারণার ॥

রবীন্দ্র শতবর্ষ
১২৬৮—১৩৬৮
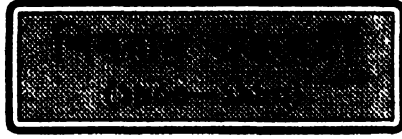
গ্রন্থের নাম : **চুম্বন**
প্রথম প্রকাশ : ১৯২৯

মোর উপহারে
আমার চুম্বন
আমি দিলাম তোমারে

গ্রন্থের নাম : **আমার লেখা**
প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮

বাপুজী—তুমি
আমাদের দিয়ে গেছ স্বাধীনতা
সে স্বাধীনতায় নিয়েছি তোমার প্রাণ
আপনার বলে করিলে মোদের-বলী
আপনারে শেষে দিলে মহাবলিদান।
তোমারে যা দিই, মানুষে দি অঞ্জলি ;
তোমারে প্রণাম, ভারতেরে সে প্রণাম।

গ্রন্থের নাম **বড়দের হাসিখুশি**
প্রথম প্রকাশ ১৯৫১

দুমত মিলিয়া এক মন হলে
হয় নাকি আরো হালকাই?
দুজনের খুসি ওজনে, আসলে
সমান হাসির পাল্লায়ই।

গ্রন্থের নাম : **ভুতুরে ও অদ্ভুতুরে**
প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

ভুতুরে অদ্ভুতুরে
দিলাম তে ভুতু-রে
শ্রীময়ী শ্রী কাবেরী বসুকে
আমার আশীর্বাদ
খুশি ও হাসির-স্বাদ
চিরদিন ধরে পাক ও সুখে॥

—শিবরামদা

গ্রন্থের নাম : **ফার্স্ট বয়**

শ্যামল, সমীর বীহরনে
দিলাম এ ফার্স্ট বয়।
সব কিছুতেই জীবনে
যেন তারা ফার্স্ট হয়।

—শিবরামদা

গ্রন্থের নাম : বালুচর
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩০

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণকমলেষু

তোমরা দু'ভাই রঙ লয়ে কর রঙের খেলা,
সন্ধ্যা-সকাল, সকাল-সন্ধ্যা সারাটি বেলা।
ছবি আর ছবি বরণে বরণে আসে ও যায়
রেখার বাঁধনে ধরা পড়ে কেহ, কেহ পালায়।

রঙের সায়রে কমলেরা যেন খেলায় জল
কেউ ডুবে কেউ ভেসে উঠে করে কৌতূহল।
তোমরা দু'ভাই তীরে দাঁড়াইয়া রও যে চেয়ে
কি যেন কুড়াও, কি যেন হারাও কি যেন পেয়ে।

তোমরা দু'ভাই রঙ লয়ে খেল রঙের নায়
রতন মানিক কুড়ায়ে ফিরিছ সুদূর গাঁয়।
কালেরে তোমরা মানিতে চাহ না,—নিকট দূর,
তোমাদের যেন মুঠোর মধ্যে সকল পুর।

কেউ চলে যাও রূপকথা পুরে, রাজার কনে
ঘুমাইয়া হাসে, হাসিয়া ঘুমায় আপন মনে ;
তার সাথে যেয়ে ভাব করে আসো রেখার ডোরে
তার মনে বাঁধো স্বপনের পর স্বপন ধরে।

কেউ কথা কও পাষাণের সনে, মোগল পুরি—
নানা বরনের লহরে লহরে হসিছে ঘুরি।

মতি মহলের অজানা হেরেমে বাদশাজাদী,
বেদনা তাহার পাষাণে পাষাণে ফিরিছে কাঁদি,
পাষাণে পাষাণে কান পেতে পেতে শুনিছ খালি,
আপনার মনে রঙের উপর রঙেরে ঢালি।

রঙের কুমার, চেয়ে থাকি মোরা মুখের পানে,
এত কাছে রও, তবু তোমাদের বুঝি না মানে।
তোমাদের বুকে কত রঙ আছে! আরো কি কায়া,
তোমাদের ঐ রঙের সায়রে দোলাবে ছায়া!
আরো কত ব্যথা, আরো কত হাসি রয়েছে বাকি,
আজো দেখা তারা দেয়নি,—যাদের লইবে আঁকি?

তোমরা দু'ভাই ছবি আঁকো বসি—শুধুই ছবি,
কথা নাহি কও রঙে রঙে মাখা নীরব কবি।
ভাষার দেশেতে বসতি আমার, অবাক মানি,
তোমাদের সেই কথা-নাই দেশ কেমন জানি!
সে যেন কেমন রঙে আর রঙে রেখায় রেখা
টানিয়া টানিয়া মনের কথাটি মনেতে লেখা!

তোমাদের দেশ না জানি কেমন, যেখানে সবে,
রঙের বাক্সে কথারে পুরিয়া রয় নীরবে।
সেই দেশে আজি পাঠাইয়া দিনু আমার গান—
তুচ্ছ এ—তবু পূর্ণ প্রাণের পূজার দান।

১৩৩৭ স্নেহের—
গ্রাম—গোবিন্দপুর জসীমউদ্দিন
ফরিদপুর।

গ্রন্থের নাম ঃ **রূপবতী**
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪৬

সত্যনিষ্ঠ চির নির্ভীক অক্লান্ত যোদ্ধা
মৌলবী ফজলুর রহমান এম. এল. এ
বন্ধুবরেষু--

অনেক ঝড়ের রাতে তুমি জ্বালায়েছ বাতি,
বন্ধু-হীন বহু পথে তুমি হইয়াছ সাথী।
যাদের করেছ ভালো তাহারা বোঝেনি তোমা,
তাদেরই আঘাত তাই জীবনে করেছ জমা।
মরারে বাঁচাতে যেয়ে যাহারা মরিতে জানে,
হয়ত তাদেরি লহু বহিছে তোমার প্রাণে।
এ শুভ কামনা মম লিখিনু হৃদয়-দলে,
আমার-এ ক্ষুদ্র দান তোমারে দেবার ছলে।

ফরিদপুর জসীমউদ্দিন
গ্রাম—গোবিন্দপুর
২০।৫।৪৬

গ্রন্থের নাম ঃ **মাটির কান্না**
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫১

মেরী মিলফোর্ড
জয়যুক্তায়ু

তুহীন তুষার শ্বেতদীপের মণি মানিকের ঘরে,
আমার দেশের নক্সী কাঁথাটি ধরিয়া মেলন করে ;
কোন সে স্বপন মাধুরী হেরিয়া হাসিছ সোনার মেয়ে,
এদেশের কথা শুনাইব তাই তোমারে নিকটে পেয়ে।

কাব্যগ্রন্থ : রাখী
প্রথম প্রকাশ : ১৯২৯

উৎসর্গ

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দক্ষিণ করে—
আমরা দু জনা দুই কাননের পাখি,
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখি॥

গ্রন্থের নাম : **উদাত্ত ভারত**

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৫৬

শৈলজাভূষণ ঘোষ

বন্ধুবরেষু

তুমি দেখা দিলে জীবনে আমার
বলিষ্ঠতম প্রাণ-চেতনার
ঝড় তুলে একী স্বচ্ছ উদার দরাজ উচ্চহাসিতে।
জাগালে রক্তকরবীর শিখা
ঘোচালে রাতের ক্রূর কুহেলিকা
ফু দিয়ে বাজালে একী সুর অমারাতের নীরব বাঁশিতে।

আমার কবিতা হারানো ছড়ানো
অনাদরে ছিল তিমির জড়ানো
ত্রিশ বছরের বেদনার বোঝা বুকে নিয়ে এতকাল,
বাঁচালে তাদের হে বন্ধু তুমি
জোয়ারে ভাসালে ধু ধু মরুভূমি
নামালে গঙ্গা ত্রিশূলে ভেদিয়া দারিদ্র-জটাজাল।

আমার বুকের ভাঙা হাড়গুলি
জুড়ে দিলে ধুয়ে মুছে যত ধূলি
দিলে অবয়ব একী বৈভব ঝরাফুলে গাঁথা মালা।
হে বন্ধু তাই এ মালা তোমার,
কণ্ঠে পরায়ো মহাজনতার
সর্বহারার রাঙা চেতনার রক্ত মশাল জ্বালা।

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৩ বিমলচন্দ্র ঘোষ

গ্রন্থের নাম : ছড়াছড়ি
প্রকাশক : মুক্তমন
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০২

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী সরিৎশেখর মজুমদার
সুরসিকেষু,

সাহিত্য সাধক মস্ত
ছড়ায় সিদ্ধ হস্ত,
কানাকড়ি 'ছড়াছড়ি'
তাঁরই উপর ন্যস্ত।

গ্রন্থের নাম : **পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ**
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০

উৎসর্গ

ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনো।

স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে
আমার শরীরে যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।

বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে সেই হাত
গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।
স্তূপ হয়ে অন্ধকারে সোনরঙা সুর ওই ওঠে আর উঠে ঝরে পড়ে।

সেই সুরে খুলে যায় নামহারা গহ্বরের মৃতদেহগুলি
পিছনে অলীক হাতে তালি।
অবসন্ন ফিরে দেখি ঘাসের উপরে শুয়ে আছে

পুরোনো বন্ধুর দল
শিশির মাখানো শান্ত প্রসারিত হাতগুলি বাঁকা।

গ্রন্থের নাম **কবিতার মুহূর্ত**
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৭

উৎসর্গ

আমারই বুক থেকে ঝলক
পলাশ ছুটছিল সেদিন

লোকেরও লাগছিল ভালো
লোকের ভালো লাগছিল

লোকে কি জেনেছিল সেদিন
এখনও বাকি আছে আর কে?

আসলে ভেবেছিল সবই
উদাস প্রকৃতির ছবি।

তবু তো দেখো আজও ঝরি
কিছু না থেকে কিছু ছেলে

তোমারই সেন্ট্রাল জেলে,
তোমারই কার্জন পার্কে।

গ্রন্থের নাম ঃ **সব কিছুতেই খেলনা হয়**
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৭

কুড়োনো ফল পুরোনো ফল
নতুন কেবল ঝাঁকা
পুরোনো হাত নতুনকে দেয়
ইমনকে দেয় 'ফাঁকা'

গ্রন্থের নাম : **উন্মাদের পাঠক্রম**

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬

১২ মে ৮৪ রাত্রির

সমস্ত শ্মশান বন্ধুকে

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি আয় ধাত্রী ভাণ্ড খুলি তোর
লিখেছি সাতকাণ্ড আমি খণ্ড করে ফ্যাল আমাকে
খণ্ড হার খণ্ড উরু
দ্বিখণ্ডিত বস্তিদেশ, অণ্ড কাটা শিখণ্ডিত মুণ্ডুঅলা দেহ
জগৎভূমে নৃত্য করে হাত পা ছুঁড়ে নৃত্য করে
অগ্নিভূডি ফাটিয়ে শেষকৃত্য করে তোর
করে না, কেউ করায় তাকে, ওঠেরে ধূমলক্ষ পাকে
যজ্ঞভূমে কাটা আঙুল লকলকিয়ে বৃক্ষ আঁচড়ায়
হা লকলক হো লকলক ভুঁয়ে গড়ায় জ্যান্ত চোখ
কী আনন্দে স্কন্ধ ছিঁড়ে শরীরহারা কামানো এক মাথা
যায় রে যায় শূন্য পথে কাটাগলায় অগ্নি পড়ে
শেষ কামড়ে কামড়ে ধরে বক্ষহারা ভাণ্ড তোর লৌহলালা খায়

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃধারা যায়রে গঙ্গায়...

গ্রন্থের নাম : শিবানী
প্রথম প্রকাশ : ১৯২১
শিশির পাবলিশিং হাউস

উৎসর্গপত্র

প্রিয় লীলাদি!

জীবনের যত কাজে,
কত ভুল যে গো হয়ে যায় হায় জানা অজানার মাঝে।
মানুষের চোখে জীবন ভরিয়া সব হয়ে থাকে জমা,
তাদের বিচারে সে ভুল ত্রুটির বুঝি আর নাহি ক্ষমা।
ধন্য সে প্রাণ, সে ভুলের মূলে সকরুণ দৃষ্টি যার—
মানব মনের দুর্ব্বলতা যা, করিয়া আবিষ্কার।
মমতায় ভরা হৃদয় লইয়া, বুল নির্দ্দেশ করি,
ভ্রান্তের প্রাণ, কি এক মহান মহিমায় দেয় ভরি।
বাঙলার কত ঘরে-ঘরে হায়-কার-ভুলে জানি না তা,
কত সংসার, কত কত প্রাণ, জ্বলে যায় যথা তথা ;
দু একটি ছবি দেখেছি যা তাই আঁকিলাম মনে মনে ;
ভাল কি মন্দ, সে বিচার ভার দিলাম অন্য জনে ;
পার যদি বোন, ক্ষমা করো তবে এ ভুলের ত্রুটি মোর,
পার যদি ফেল শিবানীর তরে দু'ফোটা আঁখির লোর।

তোমার স্নেহের-
"সরসী"

গ্রন্থের নাম : **প্রবাল**
প্রথম প্রকাশ : ১৯২৭
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

উৎসর্গ

স্নেহভাজন কবি শ্রী নরেন্দ্র দেব

নূতন বছর
আবার এলো
কালসাগরের তীরে—
নূতন আলো
উঠ্‌লো ফুটে
যাত্রীজনে ঘিরে॥
মনটি যাদের
সবুজ কাঁচা
এই নবীনের তুলি—
রঙের পর
রঙ ফলাবে
মুছে মলিন ধূলি—
এনেছি তাই
নবীন দান
লওগো হাসিমুখে—
দিলাম "সেবা"
তোমার হাতে
স্নেহের গর্ব্বসুখে॥

বাণীকুটীর
গিরিডি, ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

স্নেহের
সরসী দিদি

গ্রন্থের নাম : **শবরী পৃথিবী জাগে**
প্রকাশক : সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৮০

উৎসর্গ

সুখে দুঃখে আলোকে আঁধারে
অজানা দুর্গম পথে যে-মানুষ চলে বারে বারে
ক্লান্তিহীন অবিশ্রান্ত গতি—
তাদের চরণোপান্তে রেখে যাই আমার প্রণতি।

গ্রন্থের নাম : **ইংলে পিংলে**
প্রকাশক : পুনশ্চ

দিচ্ছ কাকে?

ইংলে পিংলে দিচ্ছ কাকে?
মন পেয়েছে সঙ্গী যাকে
বাদল মাদল দলমা পাহাড়
চাকা নদীর বাঁকে বাঁকে
বাঁকানদীর পাঁকে পাঁকে
হিমঝুরি সিম নিমভরা মৌচাকে চাকে
দোয়েল কুবো কাক কোকিলের ডাকে ডাকে
ধান-পাকা খেত মন-পাখা মেঘ টিয়ার ঝাঁকে
বেড়ার ফাঁকে
ঘাসপোকাদের শালবনী রং অঞ্চলি-ঢং সাজপোশাকে
সকাল বিকেল সন্দে-শাঁকে
কোজাগরীর জোস্না-মোড়া উঠোন-জোড়া আলপনাটির
পাকে পাকে
জীবন-খুড়োর হাঁকে ডাকে
এক বয়িসী সেই মারাকে।

গ্রন্থের নাম ঃ **উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস**

উৎসর্গ

আমাব আত্মজন যাবা
তাদেরি মুক্তিতে সামিল আমার মুক্তিব-ঘোষণা।
তাদের কথাই—স্মৃতি,
তাদের বেদনা—তাই আমার বক্তব্য।
সারা শরীরে সভ্যতার মশাল জ্বেলে
পুড়ে অঙ্গার অন্নহারা
তারা,
আজও
প্রতারণার বধ্যভূমিতে বাঁধা
অজস্র স্পার্টাকাস—
সময় গুনছে ধৈর্যের অসংখ্য অগোচর প্রস্তুতি পর্বে।

ভূমিহীন, অর্থহীন, বঞ্চিত জীবনের
দেড় শতাধিক বছর পেরিয়ে
আজো তারা ফসলের অর্জিত অধিকারে
অনন্ত দখল বসাতে পারেনি
ঠিকই, তবু—
মাথা নিচু বশ্যতার ক্রীতদাস নয়
তারা, নিজেরাই জানে,
হাতের লাঙ্গলে তাদের
ভুরো করা মাটির ভালবাসা
লক্ষকোটি কণ্ঠের শব্দে তাদের
এনে দিয়েছে সোঁদা উর্বর শষ্যগন্ধের চিৎকার।

শেকলের গণ্ডী ভেঙে-ফেলা, শাসনের দেয়াল-ফাটানো সংকল্পে
তাদের অন্তহীন যাত্রা
দীর্ঘতর হয়ে চলেছে উজ্জ্বল এক ক্রমমুক্তির দিকে—
এপার ওপার বাংলায় সে পারাপার সুরু থেকে আজো ক্লান্তিহীন
গ্রামে গঞ্জে মানুষের বিপুল মুক্তি আজো তাই
আশায় উদ্যমে অপেক্ষায়
একটি মাত্র
জলোচ্ছ্বাসের জন্য স্থির হয়ে আছে।

আমার অভিনন্দন ছড়িয়ে দিয়েছি দুই বাংলার
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সংগঠিত মানুষের স্মরণে।
শ্রদ্ধায় অভিভূত উৎসর্গে
আমার এই কুড়িয়ে-পাওয়া দলিলের সমগ্র ইতিহাস
তাই পাতায় পাতায় তুলে দিলাম তাদেরই হাতে হাতে
এই সামান্য গ্রন্থের আগাগোড়া কৃতজ্ঞতায়।

শ্রেণীহীন নতুন মানুষের চোখেই ফুটে উঠুক
সেই রৌদ্রের আভা।

আমার রচনায় যৌবন এনে দিক নিরক্ষরের প্রেম।

———

গ্রন্থের নাম : **মঞ্জরী**
প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৪
প্রকাশক : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী

উৎসর্গ

বহুদিন,
যাদের ধূসরছায়া স্মৃতির গোধূলিলোকে হয়েছে বিলীন,
তবুও বিমনাক্ষণে, সঙ্গীহীন, মৌন নিরালায়,
যারা করে আনাগোনা আনমনা মনোমাঝে
শব্দহীন পায়ে,
যাদের গিয়েছি ভুলে, তবুও আজিও ভুলি নাই,
চেতনা প্রকোষ্ঠ হ'তে মগ্ন চেতনায় যারা
পেল আজ ঠাঁই,
নিত্য চঞ্চলিত মোর কৈশোরের দিনগুলি
করিয়া স্মরণ,
আমার এ মঞ্জরীরে সেদিনের সাথীদলে
করি সমর্পণ।

গ্রন্থের নাম : শিশু সাহিত্য ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকার
প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার অ্যাসোসিয়েশান
প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৭

উৎসর্গ

দিদিমা,
জীবন-উষার অরুণরাগে,
মনে পড়ে সবার আগে,
তুমি এবং হাসি খুসি দাদু
আমার ধূলোখেলার ঘরে,
কোন মায়াতে কেমন করে,
ছড়িয়ে দিলে কি মোহ, কি যাদু।

কিছু বা তার আছে মনে
জীবন পথের সন্ধিক্ষণে,
কিছু বা তার হারাল কোন্ দেশে।
স্মৃতিসাগর মন্থন করি,
কিছু তাহার উধার করি,
ডুব দিয়ে তায় ডুবুরীরই বেশে।

সেই মণি ও মুকুতাতে
গাঁথা মালা এই দুহাতে
জানি না এর কিবা আছে দাম।
ষষ্ঠনববিংশতিতে,
আছ তবু দানটি নিতে,
সেই খুশীতে তোমারে তাই জানাই প্রণাম।

—রঞ্জিতা

গ্রন্থের নাম ঃ **হিমানীশ গোস্বামী**
কথার ঠাট-কথকের ঠাট্টা
সম্পাদনা ঃ অনির্বাণ রায় / অন্তরা আচার্য

হাসির টানে কান্নাকাটি
নেইকো এতে ফাঁকি
যেমন ধারা হাসতে শিখি
তেমন করেই হাঁটি।

যেজন আছেন দুখ-মুলুকে
মুখখানি ভার ভার
তাঁর সঙ্গেই খুলতে হবে
সহাস্য কারবার।

হাসির পুঁজি লগ্নি করার
পরম মহাজন—
শ্রী হিমানিশ গোস্বামী নাম
সহাস-সভাজন।

তাঁরই কাছে বন্ধক দিই
এই ছেঁড়া তমসুক
তিনিই দেবেন বাদবাকি ঋণ
তাঁর ঘাড়ে বন্দুক।
তুলে দিয়েই ক্ষ্যান্ত দিলাম
এবার তিনি তাঁর
নিজের মতো করেই দেবেন
হাসির রাশির ধার।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

অপরাজিতা দেবী রচনাবলী—নবনীতা দেবসেন সম্পাদিত
আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন ও কাব্য—মদনমোহন কুমার
কবি মানস—বারীন্দ্র বসু
কবি বিহারীলাল—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা
কবি সত্যেন্দ্রনাথ —সনজিদা খাতুন
কাজী নজরুল প্রসঙ্গে—মুজফ্‌ফর আহমেদ
কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহমেদ
কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা—রফিকুল ইসলাম
কান্ত কবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
গোবিন্দ চয়নিকা—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত
গ্রন্থ উৎসর্গে রবীন্দ্রনাথ—মোহনলাল মিত্র
ত্রিপুরার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য—মোহিত পুরকায়স্থ
নজরুল চরিত মানস—সুশীলকুমার গুপ্ত
নজরুল পরিক্রমা—আবদুল আজিজ আল আমান
বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল—আজাহারউদ্দীন
বাংলার কবি—প্রমথনাথ বিশী
মৃণালিনী দেবী—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি—ডঃ অমরেন্দ্র গনাই
রবি জীবনী (বিভিন্ন খণ্ড)—প্রশান্ত কুমার পাল
রবীন্দ্র জীবন কথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র পরিকর—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র স্মৃতি—বনফুল
স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য—পশুপতি শাসমল
সাহিত্য সাধক চরিতমালা (বিভিন্ন খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্তি—নরেন্দ্রনাথ লাহা।